হিন্দোলা লীলা



অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়



হিন্দোলা লীলা

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ
মাধাই মোদক, পানিহাটি, ২৪ পরগণা (উঃ)
২৫৫৩-৩২৭২

প্রকাশকাল ঃ
ঝুলন পূর্ণিমা, ৫ই ভাদ্র, ১৪০৮ (২২শে আগষ্ট ২০০২)

প্রচ্ছদপট ঃ দেবাশীস মান্না

মুদ্রণ ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র মান্না
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টিং
১৯ই/এইচ/১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্
কলকাতা-৭০০ ০০৯

অর্ঘ্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১। পানিহাটী পাটবাড়ী (রাঘব ভবন) ২৮৭৫-৩০৩২
২। বরাহনগর পাটবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর, কলকাতা
৩। সমাজ বাড়ী নবদ্বীপ

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব

১০৮ শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত পরম ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ দাস বাবাজীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি সাদরে সমর্পিত হ'ল।

কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থিনী

স্নেহের রমা

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম!
জপ হরে কৃষ্ণ হরে নাম।।

মুখবন্ধ

শ্রীগুরু মহারাজের অপার করুণায় আজ এক শুভক্ষণে শ্রীশ্রীরাধারাণী এবং প্রাণগোবিন্দের পরম রসময়ী প্রেমময়ী লীলা হিন্দোলা-লীলা বা ঝুলন-লীলা গ্রন্থ প্রকাশ পেলেন। শ্রীগোবিন্দ পরতত্ত্বসীমা এবং তাঁর হ্লাদিনীশক্তি মূর্তিমতী হলেন বৃষভানুনন্দিনী। এঁদেরই পরম ভাবময়ী লীলা হলেন শ্রীশ্রীঝুলন-লীলা বা যার এপর নাম শ্রীহিন্দোলা-লীলা। শ্রীগোবিন্দজী অবশ্য সর্বরসের ভোক্তা, সব রসই তিনি আস্বাদন করেন। সবরস বলতে চারটিকে বুঝায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। কিন্তু রসবিচারে মহাজন দেখিয়েছেন পর পর রসের উৎকর্ষ। দাস্যের চেয়ে সখ্যরসের, সখ্যের চেয়ে বাৎসল্যের এবং বাৎসল্যের চেয়ে মধুররসের উৎকর্ষ। এই মধুররসই গোবিন্দ অশেষ বিশেষ আস্বাদন করেন। এই মধুর রসই গোবিন্দের জীবাতু, এটি না হলে যেন তাঁর প্রাণ বাঁচে না। এই মধুররসকে সুস্বাদু করবার জন্য পাশে আছেন দাস্য সখ্য বাৎসল্য রস। মানুষ যেমন অন্নভোজন করে কিন্তু শুধু অন্ন তো কেউ ভোজন করে না। অন্নকে সুস্বাদু করবার জন্য যেমন পাশে থাকে ডাল তরকারী শাক ভাজা কত কি। কিন্তু অন্নই মানুষের খাদ্য। এখানেও তেমনি।

হিন্দোলা-লীলা প্রাত্যহিক লীলা এবং দিবাভাগে মধ্যাহ্ন লীলা। ভিন্ন ভিন্ন মহাজন তাঁদের নিজ নিজ অনুভবে লীলারস আস্বাদন করেছেন। তবে অনুভবের তারতম্য আছে। কারণ সকলের অনুভব তো সমান নয়। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ এবং শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এই হিল্লোলা-লীলা আস্বাদন করেছেন। তাঁদের এই আস্বাদনের মধ্যেও দেখা যায় কিছু তারতম্য আছে। বর্তমান গ্রন্থে-শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-গ্রন্থের একাদশ সর্গের মূল বাহান্নটি শ্লোক সংযোজিত হয়েছে আর তার সঙ্গে মূল শ্লোকের টীকা

এবং বঙ্গানুবাদও দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শ্লোক অনুযায়ী তার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

রাধাগোবিন্দের লীলাকীর্তনের আগে গৌরচন্দ্রিকা পদকীর্তনের রীতি আছে, তার প্রয়োজনীয়তাও বিশদভাবে বলা হয়েছে। গৌরচন্দ্রের ঝুলন লীলার বিভিন্ন পদকর্তার কিছু পদও সংযোজিত আছে। যার ফলে লীলা রসামোদীর প্রাণের যে আকাঙ্খা ও রস আস্বাদনের যে উৎকণ্ঠা তার সন্ধান পাবেন আশাকরি। ভক্তজনের হৃদয়গ্রাহী হলেই গ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা। ক্ষুদ্র জীবাধমের ত্রুটি বিচ্যুতি তো স্বাভাবিক। তবে রসামোদী ভক্তজন ক্ষমাসুন্দর চোখে সকল ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন, এইটিই ভক্তজনের শ্রীচরণে অসংখ্য ভক্তিবিনম্র প্রণতি নিবেদন ক'রে একান্ত প্রার্থনা।

অলমিতি
গ্রন্থকার

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম!
জপ হরে কৃষ্ণ হরে নাম।।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত একাদশ সর্গঃ

হিন্দোলা-লীলা

(শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত)

১। নির্যন্ কুঞ্জালাদি পালী পরীত ঃ কৃষ্ণ ঃ কান্তাপাঙ্গভৃঙ্গা বিলীঢ়ঃ।
পঞ্চেষুণাং সঞ্চয়ং প্রাঞ্চয়ন্ কিং প্রাদাগ্রেত্বিট্ কণং স্বং বিরেজে।।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমকৃত টীকা

কৃষ্ণঃ স্বকীয়ং পদাগ্রস্যৈক কান্তিকণং পঞ্চেষুণাং সঞ্চয়ং কন্দর্প সমূহং প্রাঞ্চয়ন্ পূজাং কারয়ন্ রেজে। তদীয়কান্তিকণোঽপি কন্দর্পকোটিভিরপি প্রাপ্তুমভিলক্ষ্যত ইতি ভাব ঃ।।

শ্রীমধুসূদনতত্ত্ববাচস্পতিনা বঙ্গভাষয়ানুদিতম্।

সখীসমাজ পরিবৃত নাগরেন্দ্র কুঞ্জ কুটীর হতে বাইরে এসে বিরাজ করছেন। তখন শ্রীরাধার অপাঙ্গ ভৃঙ্গ তাঁর মধুমাধুর্য্যসুধা আস্বাদন করতে লাগল। আমরি! সেই অপূর্ব্ব সুষমারাশি অবলোকন করে কোটি কোটি কন্দর্প যেন কন্দর্পমোহন শ্যামসুন্দরের পদাগ্রের কান্তিকণার অর্চ্চনা করতে লাগল। তার কণামাত্র পেলে তারা কৃতার্থ হয়ে যায়—এইটিই তাদের মনের অভিলাষ।

২। বীক্ষ্যাকাস্মাৎ প্রেয়সঃ সব্যদোযতা রাধাস্কন্ধং সন্দিতং স্বং চকম্পে।
মাধুর্য্যব্ধেরুত্তরেণ কেনাপ্যভ্যামৃষ্টা কানকান্তোজিনীব।।

টীকা—রাধা কৃষ্ণস্য বামহস্তেন স্বকীয়ং স্কন্ধং সন্ধিতং বদ্ধম্ অকস্মাৎ বীক্ষ্য আনন্দাৎ চকম্পে। অত্র উৎপ্রেক্ষামাহ। কেনাপি মাধুর্য্যসমুদ্রস্য তরঙ্গেণ সংযুক্তা স্বর্ণকমলিনী ইব।

অনুবাদ অনন্তর বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণও নিজ বাম বাহু নাগরিণীমণি শ্রীরাধার স্কন্ধে অর্পণ করলেন। তা দেখে শ্রীরাধা সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে আবিষ্টা হলেন। আনন্দপুলকভরে দেহবল্লরী মৃদুমন্দ স্পন্দিত হল! এ শোভা মাধুরী দেখে মনে হয় যেন এক অনিন্দ্য মাধুর্য্য সমুদ্র তরঙ্গ স্পর্শে প্রফুল্ল কনকনলিনী মন্দ মন্দ কম্পিত হচ্ছে।

৩। পার্শ্বদ্বন্দ্বে দীয়মানে সখীভ্যাং রাধাকৃষ্ণৌ চারুতাম্বুলবীট্যৌ।
নীত্বা সব্যাসব্যপাণ্যঙ্গুলীভির্ব্বক্ত্র দ্বন্দ্বেঽন্যোন্যমেবাদধাতে॥

টীকা—রাধাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে সখীভ্যাং দীয়মানে তাম্বুলবীট্যৌ রাধিকায়া বামাঙ্গুলিভিঃ কৃষ্ণস্য দক্ষিণাঙ্গুলীভিশ্চ করণৈঃ রাধাকৃষ্ণৌ নীত্বা পরস্পরমুখদ্বয়ে আদধাতে।

অনুবাদ—তাঁদের দুই পার্শ্বে দুই সখী দাঁড়িয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হাতে তাম্বুল বীটিকা দিচ্ছেন। শ্রীরাধা বামহাতের অঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে আর শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলী দ্বারা শ্রীরাধার বদনকমলে দিচ্ছেন।

৪। বামা প্রেয়োবামপাণিং নিরাস্যদ্বক্ষোজং স্বং স্প্র,টুকামং করেণ।
চিত্রং মন্যেঽরুন্ধলাবণ্যবাপী পদ্মং চক্রাস্বাদিরক্তোৎপলেন॥

টীকা—বামরাধা স্বস্কন্ধস্থিতং কৃষ্ণস্য বামপাণিং স্বং বক্ষোজং প্রষ্টুকামং করেণ নিরাস্যৎ। উৎপ্রেক্ষামাহ। স্তনরূপচক্রবাকমাস্বাদয়িতু শীলং যস্য তথাভূতং কৃষ্ণস্য বাহুরূপলাবণ্য বাপ্যা হস্তরূপপদ্মং রাধায়াঃ হস্তরূপে রক্তোৎপলেন অরুন্ধ ইতি অহং চিত্রম্ আশ্চর্য্যং মন্যে। তদ্ যথা অচেতনস্য পদ্মস্যাস্বাদ কর্ত্তৃত্বন্। এবং সূর্য্যরূপৈক মিত্রয়োর্দ্বয়োঃ প্রণয় এব উচিতঃ প্রত্যুত হিংসা। অপরঞ্চ চক্রবাকানাং বিপক্ষরূপচন্দ্রস্য মিত্রেণ উৎপলেন তেষাং সাহায্যকরণমিত্যাদ্যাশ্চর্য্যং জ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ—বিদগ্ধরাজ শ্রীরাধার স্কন্ধস্থিত বাম করকমল দ্বারা তাঁর বক্ষোজকমল স্পর্শ করতে উদ্যত হলে বামা শ্রীরাধা সেই বাহু ঠেলে সরিয়ে দিলেন। মরি! এ দৃশ্য বড় বিচত্র বড় অদ্ভুত। দেখে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ লাবণ্যসরসী শোভী করপদ্ম শ্রীরাধার বক্ষোজরূপ চক্রবাককে আচ্ছাদন করতে যাচ্ছে আর শ্রীরাধার কর রক্তোৎপল তাকে বাধা দিচ্ছে। জড়স্বভাব পদ্মের আস্বাদন চেষ্টা বড় আশ্চর্য্য এবং চক্রবাক ও পদ্ম উভয়ের মিত্র সূর্য্য সুতরাং এদের মধ্যে পরস্পর প্রণয় থাকা উচিত। কিন্তু আশ্চর্য্য উভয়ের মধ্যে হিংসাভাব দেখা যাচ্ছে। আবার চক্রবাকের বিপক্ষ চন্দ্র সেই চন্দ্রের মিত্র উৎপল মিত্রের শত্রু চক্রবাকের সাহায্য করছে এও বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।

৫। শাখিব্রাতৈরাবৃতেঽপ্যন্তরন্তঃ সূর্য্যদ্যোতি প্রস্ফুরত্যাকুলাত্মা।
সদ্যঃ স্বেদি শ্রীমুখং স্ব-প্রিয়ায়া স্তির্য্যঙ মৌলিচ্ছয়য়াচ্ছদং সঃ॥

টীকা—শাখিব্রাতৈঃ বৃক্ষসমূহৈরাবৃতেঽপি সূর্য্যকিরণৈরন্তরন্তঃ পত্রাদীনাং ছিদ্রদ্বারা মধ্যে মধ্যে স্ফুরতি সতি সদ্যস্তৎক্ষণ এব রাধায়াঃ স্বেদযুকং শ্রীমুখং বীক্ষ্যাকুলাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ তির্য্যক্ মুকুটচ্ছায়য়া আচ্ছাদয়েৎ।

অনুবাদ—অনন্তর তরুচ্ছায়া সমন্বিত বনপথে প্রণয়ী যুগল পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন করে গমন করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে পাতার ফাঁকে ফাঁকে নির্গলিত রবিরশ্মি সংস্পর্শে শ্রীরাধার আরক্ত মুখখানি স্বেদাম্বুকণামণ্ডিত হচ্ছে দেখে প্রেমিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে মস্তকের চূড়া হেলিয়ে ছায়া দ্বারা আচ্ছাদন করলেন।

৬। ভূমৌ বিদ্যুদ্বারিদৌ পর্য্যভাতামিন্দু তত্তদ্বর্ণভাজৌ দিনেঽপি।
ভব্যালীনাং যৌ দৃদিন্দীবরাণি প্রোৎফুল্লান্যেবাকৃষতাং সদৈব॥

টীকা—ভূমৌ তত্রাপি দিনে বিদ্যুন্মেঘয়ো পীতশ্যামবর্ণভাজৌ। ননু দিবসে উদিতোঽয়ং কেন হেতুনা চন্দ্রত্বেন নির্নীতি? তত্রাহ। যৌ চন্দ্রৌ ভব্যালীলাং মঙ্গলযুক্তসখীনাং দৃষ্টিরূপেন্দীবরাণি সদৈব প্রোৎফুল্লান্যেবাকৃষতাং চক্রতুঃ।

অনুবাদ—শ্রীরাধাশ্যামের সেই নটনরঙ্গি গমনভঙ্গী দেখে বোধ হল দিবসে ভূমিতলে বিদ্যুৎ ও মেঘ প্রত্যক্ষ পাশাপাশি ভাবে মন্দ মন্দ অগ্রসর হচ্ছে। আর তাদের ওপর দুটি শ্রীমুখচন্দ্র পীত ও শ্যামবর্ণ ধারণ করে শোভা পাচ্ছে। যদি বলা যায় দিবসে উদয়ে তারা চন্দ্র কেমন করে হবে? আহা! ঐ যে সৌভাগ্যশালিনী সখীগণের দৃষ্টিরূপ ইন্দীবরনিচয় সর্ব্বদা প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে। এতেই তো ঐ দুটি চন্দ্র বলে সহজেই অনুমতি হচ্ছে।

৭। কোকাঃ শোকং কেকিনো হর্ষনাট্যং হংসাস্ত্রাসং পুংশ্চকোরাঃ প্রমোদম্।
তাভ্যামাপুস্তেন কিং বক্তুমীশে তদ্বৈষম্যং স্রষ্টরি ব্রহ্মণীব॥

টীকা—তাভ্যাং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং কোকাঃ চক্রবাকাশ্চন্দ্রোদয়জ্ঞানাৎ শোকমাপুঃ কেকিনঃ ময়ূরাঃ বিদ্যুন্মেঘজ্ঞানাৎ হর্ষনাট্যং হংসাঃ বিদ্যুন্মেঘজ্ঞানাৎ ত্রাসম্। চন্দ্ররশ্মি পানকর্ত্তারঃ পুংশ্চকোরাঃ মত্তচকোরা প্রমোদম্। তেন হেতুনা যথা সমবিষমস্রষ্টরি পরব্রহ্মণি নৈব বৈষম্যম্।

অনুবাদ—শ্রীরাধাশ্যামের গমন মাধুরী দেখে চক্রবাক্ সকল প্রকৃতই পীতচাঁদ ও

শ্যামচাঁদের উদয় হয়েছে জেনে শোকাচ্ছন্ন হল। কলাপীকুল দামিনী জলদ জ্ঞানে হর্ষভরে নৃত্য করতে লাগল। হংস ভয়ে অভিভূত এবং চন্দ্রিমা পানে মত্ত চকোর প্রমোদ লাভ করল। কাউকে সুখী কাউকে দুঃখী করে শ্রীরাধাশ্যাম নিজ বৈষম্য প্রকাশ করলেন। তা সমবিষম স্রষ্টা বিধাতার ন্যায় স্বাভাবিক হলেও যেমন তাতে বৈষম্য থাকতে পারে না—সেরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণেরও কোন বৈষম্য নেই।

৮। মন্দং মন্দং বৃন্দয়োদিষ্টমিষ্টং বর্ত্মাশ্রিত্য স্বশ্রিয়ারজ্যমানম্।
যান্তৌ নর্মোদন্তরঙ্গৈররণ্যং বর্ষাহর্ষাভিখ্যমাপ্তাবভাতাম্।।

টীকা—বৃন্দায়া উদ্দিষ্টম্ ইষ্টং বর্ত্ম মন্দং মন্দং যথা স্যাত্তথা নর্মরূপস্যোদন্তস্য বৃত্তান্তস্য রঙ্গৈঃ করণৈঃ যান্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ বর্ষাহর্ষাখ্যং সখ্যভাগং প্রাপ্তৌ সন্তৌ অভাতাম্।

অনুবাদ—তারপর বনদেবী বৃন্দার উদ্দিষ্ট অভীষ্টপথে সেই রসিকামণি ও রসিকবর পরস্পর বিবিধ রহস্য প্রসঙ্গ রঙ্গে ধীরে ধীরে গমন করতে করতে স্ব স্ব মঞ্জুসুষমায় বনভূমি উদ্ভাসিত করতে লাগলেন এবং অবশেষে তাঁরা বর্ষাহর্ষা নামক বনবিভাগে উপস্থিত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন।

৯। বিদ্যুন্মেঘৌ তত্র খে বর্ত্তমানাবেতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাজমানৌ ধরণ্যাম্।
স্পর্দ্ধায়াং সম্ভাবনামাপতুঃ কিং কৈ কা সংখ্যা কামিতং বা পরার্দ্ধম্।।

টীকা—বর্ষাহর্ষবিভাগোপরি আকাশে বর্ত্তমানৌ বিদ্যুন্মেঘৌ ধরণ্যাম্ এতৌ বিদ্যুন্মেঘস্বরূপৌ রাধাকৃষ্ণৌ দৃষ্ট্বা স্পর্দ্ধায়াং কিং সম্ভাবনামাপতুঃ। অপি তু ন। তত্র হেতুঃ ক্ব একা সংখ্যা ক্ব বা অপরিমিত পরার্দ্ধ সংখ্যা।

অনুবাদ—এই বর্ষাহর্ষ বনবিভাগের উপর আকাশমার্গে যে জলধর ও বিদ্যুৎ বিরাজমান তারা ধরাতলে রাধাসৌদামিনী ও শ্যামজলধরকে দেখে "উহাদের সমতুল্য হইব"—এইরূপ স্পর্দ্ধা করিবার সম্ভাবনা ও কি প্রাপ্ত হয় নি? না—এরূপ সম্ভাবনা নেই। কারণ কোথায় এক সংখ্যা আর কোথায় অপরিমিত পরার্দ্ধ সংখ্যা। সুতরাং তুলনায় সম্ভাবনা কোথায়?

১০। নোপর্য্যা বামেতয়োঃ স্থাতুমর্হৌ যাবো বা ক্ব ব্যোমসর্ব্বং নিরুদ্ধম্।
এতদ্ভাসৈবেতি কম্পৈরভূতাং সদ্যঃ পাণ্ডুভূয়ঃ বিক্রিন্দিষু তৌ।।

টীকা—উৎপ্রেক্ষামাহ। অদ্ভুত। বিদ্যুন্মেঘস্বরূপয়োরেতয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরূপরি আবাং স্থাতুং ন অর্হৌ। কিন্তু কুত্র যাবঃ যতঃ এতয়োর্ভাসা কান্ত্যা এবং সর্ব্বং ব্যোমনিরুদ্ধং

ইতি হেতোঃ কম্পৈঃ করণৈঃ সদা এবান্তরান্তরা পাণ্ডুবর্ণ মেঘবৃষ্টিচ্ছলাৎ পাণ্ডুভূয় তৌ আকাশবর্তি বিদ্যুন্মেঘৌ বিক্রিন্দিযু রোদনেচ্ছু অভূতাম্।

অনুবাদ—তখন আকাশস্থিত বিদ্যুন্মেঘ এরূপ চিন্তা করতে লাগল রাধা সৌদামিনী ও শ্যাম জলধর বনভূমি উদ্ভাসিত করে বিরাজমান করছেন। আমরা এদের ওপরে থাকবার যোগ্য নহি। কিন্তু যাই কোথায়? সমস্ত বিমানমার্গ এদের কান্তিমালায় নিরুদ্ধ হয়েছে। এরূপ ভাবতে ভাবতে ভয়ে ক্ষোভে কম্পিত হয়ে যেন তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে মধ্যে মধ্যে জলধারা বর্ষণ ছলে ক্রন্দন করতে লাগল।

১১। কিংবা হেমোদ্যোতিনীলাশ্ম দিব্যশ্ছত্রীভাবং প্রাপ্য ঘর্মাপনুত্যৈ।
বৈবর্ণাশ্রু উহতুর্গদগদোদ্যন্ মন্দ্রধ্বানেনাস্তুবাতাং মুদেমৌ।।

টীকা—উৎপ্রেক্ষান্তমাহ কিংবা বিদ্যুন্মেঘৌ রাধাকৃষ্ণয়ো ঘর্মাপুনত্যৈ সুবর্ণ যুক্ত নীলাশ্মমণিনা দিব্যশ্ছত্রীভাবং প্রাপ্য পাণ্ডুবর্ণ মেঘবর্ষা মিষ্যৎ বৈবর্ণাশ্রু উহতুঃ। গদগদোদ্যন্ মন্দ্রধ্বানেন ইমৌ রাধাকৃষ্ণৌ অস্তুবাতাম্।

অনুবাদ—অথবা সেই বিমানসঞ্চারী বিদ্যুন্মেঘ দেখে বোধ হল যেন উহারা শ্রীরাধাশ্যামের নিদাঘতাপ জনিত স্বেদাপসারণের নিমিত্ত উহাদের মস্তকের ওপর সুবর্ণমণ্ডিত নীলকান্তমণির ছত্ররূপে শোভা পাচ্ছে। তাতে নিজের সৌভাগ্য বিশেষ বিবেচনা করে আনন্দভরে বৈবর্ণা অর্থাৎ বর্ষণোন্মুখ পাণ্ডুবর্ণতা ধারণ করে থেকে থেকে অশ্রু বিসর্জন করছে এবং মন্দ্রধ্বনিরূপ গদ্‌গদ্ বাক্যে শ্রীরাধাশ্যামকে যেন স্তুতি করছে।

১২। উর্দ্ধোদ্ধোরু শ্যামশাখাসহস্রৈঃ পীতৈঃ পুষ্পৈঃ স্যন্দমানৈর্মরন্দৈঃ।
শম্পাম্ভোদ শ্রীজয়িন্যাং বিশন্তৌ নীপাটব্যাং রেজতুস্তৌ লসন্তৌ।।

টীকা—তৌ রাধাকৃষ্ণৌ কদম্বটব্যাং বিরেজতুঃ। কথম্ভূতায়াং শ্যামশাখা সহস্রৈঃ এবং পীতপুষ্পৈঃ এবং মরন্দৈশ্চ করণৈঃ বিদ্যুন্মেঘয়োঃ শ্রীজয়িন্যাম্।।

অনুবাদ—বৃন্দাবনের অসামান্য বনমাধুরী দেখতে দেখতে শ্রীরাধাশ্যাম কদম্বকাননে গিয়ে বিরাজ করতে লাগলেন। কদম্বতরুর উর্দ্ধে শ্যামশোজন সহস্র সহস্র শাখায় পীতপুষ্প ও মন্দ মন্দ মকরন্দ বিন্দু ঝরে পড়ছে। আমরি! কি সুন্দর! দেখলে মনে হয় যেন উহারা দামিনী দাম মণ্ডিত নবঘনের শোভাকেও জয় করে এক বিচিত্র মাধুরীর বিকাশ করেছে।

১৩। মধ্যে তস্যা যা মনীকুট্টিমাল্যো দ্রাঘীয়স্যঃ কৃষ্ণমুদ্বপ্রভূতাঃ।
তা বিন্দন্তেঽহর্নিশং শীধুবৃষ্টিং জাগ্রত্যা সত্যালিপাল্যৈব পাল্যাঃ।।

টীকা—তস্যা কদম্বাটব্যা মধ্যে দ্রাঘীয়স্যঃ দীর্ঘতরায়াঃ মণিকুট্টিমশ্রেণ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ্যানন্দস্য "কেয়ারী" ইতি প্রসিদ্ধা প্রভূতাঃ অতএব তাঃ কুট্টিমশ্রেণ্যঃ অহর্নিশং মকরন্দরূপং বৃষ্টিং বিন্দন্তে প্রাপ্নুবন্তি। তাদৃশ্যবপ্রস্য সেচনমুক্ত্বা রক্ষামাহ। জাগ্রত্যা অলিপাল্যা ভ্রমরশ্রেণ্যঃ পাল্যাঃ কমদ্ভুতয়া সত্যা শ্রেষ্ঠয়া।।

অনুবাদ—সেই কদম্ব কাননের মধ্যে দীর্ঘতর মণিময় কুট্টিম বা বৈদীসকল সারি সারি রয়েছে তা দেখলে মনে হয় তারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের বপ্ররূপে শোভা পাচ্ছে। আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের বিপুল আনন্দরাশিকে কে যেন নিবিড়তর করে কুট্টিমশ্রেণিরূপে কেয়ারী করে রেখেছে। আহা! সেই বৈদীগুলি প্রফুল্ল কদম্ব কুসুমের মকরন্দধারায় দিবানিশি অভিষিক্ত হচ্ছে এবং অতি রমণীয় ভ্রমরবৃন্দ বিনিদ্রভাবে তথায় থেকে নিরন্তর তাহার রক্ষা বিধান করছে।

১৪। তৎ প্রান্তোত্থস্তম্ভবদ্দ্বিদ্বি বৃক্ষোদঞ্চচ্ছাখান্যোঽন্য সংশ্লেষভঙ্গ্যা।
গোপানস্যেবাঞ্চিতাঃ সন্তি পুষ্পপ্রলম্বাঢ্যা মারকত্যোঃ বলভ্যঃ।।

টীকা—তাসাং কুট্টিমানাং প্রান্তে উৎপন্না অথচ স্তম্ভতুল্যা যে দ্বি দ্বি বৃক্ষা স্তেষাম্ উন্নতশাখানামন্যোন্যাশ্লেষভঙ্গ্যা অঞ্চিতা যুক্তাঃ বাঙ্গালা ঘর ইতি প্রসিদ্ধা বলভ্যো ভান্তি। অত্র দার্ষ্টান্তে বলভী পদাভাবেঽপি অতিশয়োক্তালঙ্কারাদেব তদর্থো বোধ্য উৎপ্রেক্ষামাহ। পাড়ি ইতি প্রসিদ্ধয়া গোপানস্যা অঞ্চিতা মরকতমণিনির্মিত বলভ্য ইব। গোপানসীতি বড়ভীছাদনে বক্রদারুণ ইত্যময়ঃ। প্রালম্বমৃদুলম্বিস্যাদিত্যমরঃ।।

অনুবাদ—সেই সকল বেদীর দুই প্রান্ত হতে উৎপন্ন দুই দুইটি কুসুমিত কদম্বতরু স্তম্ভের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। তাদের উন্নতশাখা সমূহের পরস্পর আলিঙ্গন ভঙ্গীতে গোপানসীযুক্ত বাঙ্গালা ঘর নামে প্রসিদ্ধ মকরতমণিনির্ণিত বলভী শ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছে এবং তাতে বিকসিত কুসুমনিচয় প্রালম্ব অর্থাৎ মৃদুলম্বি বন্দনমালায় ন্যায় সুশোভিত রয়েছে।

১৫। তত্তচ্ছাখালম্বিত দ্বিদ্বি শোণশ্রীমন্মুক্তররজ্জুপ্রণাদ্ধাঃ।
হিন্দোলাল্যো দ্বি দ্বি সৌবর্ণপট্টা জাতা বাতান্দোলিতাঃ সন্তি নিত্যম্।।

টীকা—তত্তৎ শাখাসুখম্বিতা শোণা রক্তাবর্ণা অথচ মুক্তাভিরামুক্তা বদ্ধা যে রজ্জবস্তৈঃ প্রণদ্ধঃ হিন্দোলাশ্রেণ্যঃ বায়ুভিরান্দোলিতাঃ নিত্যং সন্তি॥

অনুবাদ—আমরি! সেই সকল বৃক্ষশাখায় লম্বিত রক্তবর্ণ পট্টসূত্রে শোভনমুক্ত

মালাগ্রাথিত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ দুই দুইটি সুবর্ণপট্টসমন্বিত হিন্দোলাশ্রেণী নিরন্তর মৃদু মন্দ পবনান্দোলিতা হয়ে তথায় নিত্য শোভা পাচ্ছে।

১৬। পুষ্পৈঃ সূক্ষ্মশ্লক্ষ্ণচেলান্তস্থৈ র্বৃন্তোন্মুক্তৈঃ কিঙ্করীভিঃ কলাভিঃ।
আচ্ছান্নাস্তাঃ সৌরভৈঃ সৌকুমার্য্যৈ স্তাবাক্রষ্টুং সাধুশক্তিং তদাধুঃ॥

টীকা—সূক্ষ্মকোমলবস্ত্রস্য মধ্যস্থৈঃ বৃন্তোন্মুক্তৈঃ পুষ্পৈঃ কিঙ্করীভিরাচ্ছন্নাস্তা হিন্দোলাল্যঃ স্বসৌরভাদিভি স্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ তদা আকৃষ্টুং শক্তিম্ অধুঃ।

অনুবাদ—ললিতাকলাকুশলা কিঙ্করীগণ সুরভিকুসমকলাপের অপেক্ষাকৃত কঠিনতর বৃন্তাংশগুলি ফেলে দিয়ে পরাগযুক্ত সুকোমল দল নিচয় হিন্দোলার ুপর বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তার উপর সুকোমল সূক্ষ্মাবসন আবৃত করেছেন। এই জন্য সেই হিন্দোলিকাশ্রেণী তখন সৌরভে ও সৌকুমায্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আকর্ষন করার মত চমৎকার শক্তিকে ধারণ করেছে।

১৭। মধ্যে তাসাং কাঞ্চিদঞ্চং পতাকাং বীক্ষ্যারুহ্য শ্যামধামা বিরেজে।
শোভাদেব্যা সেব্যমানমিবৈতাং মন্যে মূর্ত্তানন্দ এবাধ্যতিষ্ঠৎ॥

টীকা—তাসাং হিন্দোলাশ্রেণীনাং মধ্যে অঞ্চং পতাকাং কাঞ্চিৎ হিন্দোলাং শ্রেষ্ঠাং বীক্ষ্যারুহ্য শ্যামধামা কৃষ্ণঃ বিরেজে। এতাং হিন্দোলাম্।

অনুবাদ—সেই হিন্দোলীলাশ্রেণীর মধ্যে পতাকাশোভিত একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দোলিকা দেখে শ্রীশ্যামসুন্দর তার ওপর আরোহণ করে বিরাজ করতে লাগলেন। তাতে বোধ হল যেন শোভাদেবীর সেব্যমানা হিন্দোলার ওপর মূর্ত্তিমান আনন্দ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে অধিষ্ঠিত হলেন।

১৮। কর্ষন্ কান্তাং হর্ষবর্ষাসু সম্যক্ তিম্যান্ হস্তালম্বমালম্বমানাম্।
উত্থাপ্যৈতাং স্বাগ্রতো জাগ্রতঃ কিং প্রেম্নো বাপীমাপিপৎ স্বাভিমুখ্যম্।।

টীকা—হর্যরূপবর্ষাসু সম্যক্ তিম্যান্ তিমিতুং আর্দ্রীভবিতুং কৃষ্ণঃ কান্তাম্ আকর্ষন্ স্বাগ্রতঃ প্রেম্নঃ রাদিকারূপবাপীং স্বাভিমুক্যাম্ আপিপৎ প্রাপয়ামাস।

অনুবাদ—নাগরেন্দু শ্রীকৃষ্ণ হর্ষবর্ষায় সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত হবার জন্য হস্তাবলম্বনকারিণী কান্তাকে স্বীয়হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করে হিন্দোলিকার ওপর উঠালেন এবং নিজের সামনে বসালেন। আমরি! তদ্দর্শনে বোধ হল যেন সেই মূর্ত্ত্যানন্দ মাধব রাধিকারূপ বিনিদ্র প্রেমের সরসীকে নিজের সম্মুখে স্থাপন করলেন।

১৯। পুষ্পবল্যারাত্রিকেণাস্য পদ্মদ্বন্দ্বং নীরাজ্যালিসঙ্ঘঃ সগানম্।
হারোষ্ণীযাদ্যপয়ন্ সুস্থিতত্বং স্রক্তাম্বুলস্থাসকৈঃ পর্য্যচারীৎ॥

টীকা—আলিসঙ্ঘঃ পুষ্পরাত্রিকেণ সগানং যথা স্যাত্তথা তয়োর্মুখপদ্মদ্বন্দ্ব নীরাজ্য আরোহণ সময়ে বিপর্য্যস্তং হারোষ্ণীযাদিষু স্থিতত্বমাপয়ন্ পর্য্যচারীৎ স্থাশকঃ থোর ইতি প্রসিদ্ধঃ॥

অনুবাদ—অতঃপর সখীগণ সময়োচিত গান করিতে করিতে পুষ্পের আরতি দ্বারা শ্রীরাধাশ্যামের বদনকমলদ্বয়ের নির্মঞ্ছন করতে লাগলেন এবং আরোহণ সময়ে বিপর্য্যস্ত হার ও উষ্ণিষাদি যথাপূর্বক সুবিন্যস্ত করিয়া মাল্য তাম্বুল ও চন্দনাদিচর্চ্চার দ্বারা সুচারু পরিচর্য্যা করতে লাগলেন।

২০। কাঞ্চ্যামুক্ত প্রাঞ্চিশাট্যঞ্চলান্তে কিঞ্চিৎ পৌর্ব্বাপর্য্যতোহঙ্‌ঘ্রী বিবৃত্য।
কুব্জীভুয়াদায় দোলাং ক্ষিপন্ত্যাবস্থাতাং দ্বে দিশৌ প্রাণসখ্যৌ॥

টীকা—হিন্দোলায়া দ্বে দিশৌ অনুদ্বয়োর্দিশোঃ প্রাণসখ্যৌ কুব্জীভূয় দোলামাদায় ক্ষিপন্ত্যৌ সত্যৌ অস্থাতাম্। কথম্ভূতে সম্যক্তয়া দোলানার্থং কাঞ্চ্যা আমুক্তঃ বন্ধঃ প্রকর্ষেণ পূজিতঃ শাট্যঞ্চলান্তে যয়োঃ।

অনুবাদ—পরে হিন্দোলার দুই দিকে দুই প্রাণসখী সম্যক্ প্রকায়ে দোলাবার জন্য কাঞ্চীর সঙ্গে স্ব স্ব পরম রমণীয় পট্টশাটীর অঞ্চল প্রান্ত বেঁধে এবং কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ক্রমে পদদ্বয় বিবৃত করে দাঁড়ালেন পরে তাঁরা কুব্জীভূত হয়ে দোলা ধরে নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

২১। অন্যে ধন্যে তিষ্ঠতঃ স্মেক্ষমাণে ধৃত্বা পাণ্যোঃ পুণ্যতাম্বুলবীট্যৌ।
যূনোরাস্যাম্ভোজয়োরর্পয়ন্তৌ যোগোপান্তে মঙ্ক্ষুলব্ধাবকাশে॥

টীকা—অন্যে সখ্যৌ পাণ্যোশ্চারুতাম্বুল বীট্যৌ ধৃত্বা তাম্বুলদানার্থং সাবধানতয়া ঈক্ষমাণে অধিষ্ঠতঃ। কথম্ভূতে সখীভ্যাম্ অল্পাল্পতয়া কৃতবেগস্য উপান্তভাগে অর্থাৎ যত্র বেগঃ স্থিরীভবতি তত্রৈব শীঘ্রলব্ধাবকাশে সতি রাধাকৃষ্ণয়ো রাস্যাম্ভোজয়োরর্পয়ন্তৌ যদা তু সখীভ্যাং বিনৈব রাধাকৃষ্ণাভ্যাং স্বয়মেব কৃতেঽতিবেগে সতি তদা তাম্বুলদানম্ নাস্তীতি বোধ্যম্।

অনুবাদ—আর দুই সখী করকমলে সুচারু তাম্বুল বীটিকা নিয়ে দোলার উভয় পার্শ্বে থেকে সাবধানে তাম্বুল প্রদানের সুযোগ দেখতে লাগলেন। আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হলে শ্রীরাধাশ্যামের বদনকমলে তাম্বুল বীটিকা দেন কিন্তু যখন সখীগণের

সাহায্য ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বয়ং অতিবেগে হিন্দোলা দোলাতে থাকেন তখন আর তাম্বুল দানের সম্ভাবনা থাকে না।

২২। আল্যো মান্যাঃ প্রেমবন্যা ইবান্যাঃ পর্ব্বশ্রীলাঃ সর্ব্বতঃ সাধুশীলাঃ।
হস্তোদস্তৈ শস্তরাগৈঃ পরাগৈ শ্চক্রুবৃষ্টিং দৃষ্টিমাপয্য হৃষ্টাম্॥

টীকা—অন্যাঃ মান্যা- ললিত্যাদ্যা আল্যঃ পর্ব্বশ্রীলাঃ উৎসবসম্পত্তিবিশিষ্টাঃ সত্যঃ হস্তাভ্যাম্ উদস্তৈঃ ক্ষিপ্তঃ প্রশস্তরাগযুক্তৈঃ পরাগৈঃ করণৈঃ বৃষ্টিং চক্রুঃ স্বসা হৃষ্টিং প্রাপস্য।

অনুবাদ—অপরা প্রেমবন্যা স্বরূপা সর্ব্বত সাধুশীলা ললিতাদি মাননীয়া সখীগণ উৎসব শ্রীবিশিষ্টা হইয়া এবং স্ব স্ব নয়নচকোরকে হর্ষামৃত বিভোর করিয়া শ্রীরাধাশ্যামের ওপর অঞ্জলি ভরিয়া রাগযুক্ত পরাগ বৃষ্টি করলে লাগলেন।

২৩। দেব্যস্ত্বিষ্টং মানয়ন্ত্যঃ স্বদিষ্টং তৌ পশ্যন্তঃ শ্যন্তঃ এবাখিলাধিম্।
জাতস্তম্ভা অপ্যসম্ভাবিতাশা দিব্যা তেনুঃ পুষ্পবর্ষং সতর্ষম্॥

টীকা—তৌ রাধাকৃষ্ণৌ পশ্যন্তং অতএব স্বস্য দিষ্টং ভাগ্যম্ ইষ্টং ধন্যং মানয়ন্তঃ কৃষ্ণেন সহ বিহারে অসম্ভাবিতাশাহপি জাতস্তম্ভাঃ সত্যঃ দিবি সতর্ষং যথাস্যাত্তথা পুষ্পবর্ষমাতেনুঃ। কথম্ভূতাঃ অখিলাধিং শ্যন্ত্যঃ খণ্ডয়ন্ত্যঃ॥

অনুবাদ—বিমানচারিণী দেবাঙ্গনাগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই অপূর্ব্ব হিন্দোলা লীলা দর্শন করে স্ব স্ব ভাগ্যকে ধন্য মানতে লাগলেন। সেই অখিলাধি প্রশমিনী দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারে একান্ত অভিলাষিণী হইলেও গোপীদেহ প্রাপ্তির অভাবে তাঁদের সে আশা ফলবতী হবার সম্ভাবনা না থাকলেও সাত্ত্বিক ভাবাবেশে স্তম্ভিতা হয়ে তাঁরা দিব্য কুসুম স্তবক বর্ষণ করতে লাগলেন।

২৪। তৎসঙ্গিন্যো বিপ্রষো বৃষ্যমানা হৃষ্যন্মেঘৈস্তন্মরন্দত্বমাপুঃ।
রামারাজেরঙ্গসঙ্গাত্তদীয়ে র্মুক্তাবৃন্দৈরন্ববিন্দন্ত মৈত্রীম্॥

টীকা—হর্ষযুক্তমেঘৈঃ বৃষ্যমাণাঃ বিপ্রষো বিন্দবঃ পুষ্পসঙ্গিন্য সত্যঃ তেষাং পুণ্যানাং মকরন্দত্বমাপুঃ। যস্মাৎ রামাশ্রেণ্যাঃ অঙ্গসঙ্গাৎ তাসামঙ্গস্থ মুক্তাবৃন্দৈঃ সহ মৈত্রীম্ অন্বদিন্দন্তঃ॥

অনুবাদ—তৎকালে গগনস্থ মেঘ হর্ষযুক্ত হয়ে যে জলকণানিকর বর্ষণ করতে লাগল তা সেই বর্ষিত কুসুম কলাপের সহিত মিলিত হয়ে মকরন্দত্ব প্রাপ্ত হল এবং ব্রজরামাবৃন্দের দিব্যঅঙ্গসঙ্গ লাভ করে সেই জলবিন্দু নিচয় নির্মল মুক্তাফলের ন্যায়

শোভা পেতে লাগল। বোধ হল যেন তারা ব্রজবিলাসিনীদের অঙ্গশোভি মুক্তা ভূষণের সহিত অপূর্ব মৈত্রী বিধান করছে।

২৫। জৃম্ভোদঞ্চৎ সৌরভব্রাতমাদ্যদ্ভৃঙ্গশ্রেণীস্তোত্রভাজামুখেন।
গীতৈ নীতৈর্মাধুরীং সাধুরীতি দ্যামাচ্ছাদ্য দ্যোততে স্মালিপালী॥

টীকা—আলিশ্রেণী বীণাদিকং বিনৈব মুখেন গীতৈঃ অতএব মাধুরীং নীতৈঃ প্রাপ্তৈস্তৈঃ করণৈঃ সাধুরীতি যথাস্যাত্তথা দ্যাং স্বর্গমাচ্ছদ্য দ্যোতন্তে॥

অনুবাদ—লীলা সহায়িনী সখীগণ বীণাদি যন্ত্রের সংযোগ ব্যতীত কেবল মুখে মুখেই এমন সুমধুর গীত করতে লাগলেন যে তার লয় মূর্চ্ছনাদি সুরলোক অবধি সুন্দররূপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো এবং গানকালে তাঁদের বদন কমলের যে জৃম্ভা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে অনুপম সৌরভ নিঃসৃত হয়ে চারিদিক এমনই আমোদিত করছে যার ফলে পরিমললুব্ধ অলিকূল আকুল হয়ে সেই শ্রীমুখকমলের নিকটই অনবরত গুঞ্জন করতে লাগল। বোধ হল যেন ভৃঙ্গকুল সেই ব্রজসুন্দরীর শ্রীমুখের স্তুতি কীর্তন করছে।

২৬। নৃত্যং ভেজুর্হারতাটঙ্গ মাল্যান্যাতোদ্যত্বং কিঙ্কিণী নুপুরাদ্যাঃ।
বক্ত্রে স্মিত্বা সভ্যতামদদাতে র্যুনোদোলানন্দ চন্দ্রে প্রবৃদ্ধে॥

টীকা—যুনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ দোলা বিহার জন্যানন্দচন্দ্রে প্রবৃদ্ধে সতি তয়োঃ হারতাটঙ্কমাল্যানি নৃত্যং ভেজুঃ। কিঙ্কিণ্যাদ্যাঃ আতোদ্যত্বং নৃত্যোপযোগিবাদ্যত্বং ভেজুঃ। এবং তয়োবক্ত্রে স্মিত্বা নৃত্যে সভ্যতাম্ আদদাতে।

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলাবিহার জন্য আনন্দচন্দ্র যতই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল তাঁদের হার তাটঙ্ক ও মাল্যাদি নৃত্য করতে লাগল। আর কিঙ্কিণী ও নূপুরাদি সেই নৃত্যের তালে তালে সুমধুর বাদ্য করতে লাগল এবং তাঁদের বদনাম্বুজের মৃদু হাসি তখন সেই নৃত্যসভার যেন সভ্যরূপে শোভা পেতে লাগল।

২৭। অন্যোন্যাঙ্গ প্রোচ্ছলৎ কান্তি-সিন্ধোর্বীচিব্রাতা মন্দ হিন্দোলিকাসু।
প্রাপ্তান্দোলান্যোহন্য নেত্রারবিন্দ শ্রীসন্দোহৈরাঢ্য শ্রীমাপুরাল্যঃ॥

টীকা—হিন্দোলিকায়াং রাধাকৃষ্ণয়োর্দোলনং বর্ণয়িত্বা তয়োঃ কান্তিরূপ হিন্দোলিকায়াং রাধাকৃষ্ণয়োরেব পরস্পরনেত্রমেলনং বর্ণয়তি অন্যোন্যতি। দ্বয়ো কান্তি সমুদ্রস্য তরঙ্গসমূহরূপা মন্দহিন্দোলিকাসু প্রাপ্ত আন্দোলা যয়া এবম্ভূতা যা

পরস্পরনেত্ররূপারবিন্দস্য শ্রীঃ শোভা তস্যাঃ সমূহৈঃ আল্যঃ আঢ্যতাং প্রাপুঃ। তথা চ দোলনসময়ে পরস্পর কান্তিদর্শনোত্থানন্দেন তয়োঃ শোভাতিশয়ং দৃষ্ট্বা সখ্যোহপি আনন্দিতা বভূবুরিতি ভাবঃ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধাশ্যাম হিন্দোলার ওপর দুলতে লাগলেন। তাঁদের অনবদ্য শ্রীঅঙ্গের সুষমারাশি ঝলকে ঝলকে উছলিয়া পড়তে লাগল। যেন তখন উচ্ছলিত কান্তিসিন্ধুর তরঙ্গরূপ অমন্দ হিন্দোলায় পরস্পরের নয়নকমল ধীরে ধীরে দুলতে লাগল। আমরি! মরি! নয়নকমলের সেই অপরূপ শোভা মাধুরীতে সখীগণ পরমাঢ্যতা লাভ করলেন। ফলে দোলন সময়ে পরস্পরের রূপমাধুরী দর্শনজনিত আনন্দোদয়ে নাগরীমণি শ্রীরাধা ও নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের শোভাতিশয় দেখিয়া সখীগণও অতীব আনন্দিতা হলেন।

২৮। ইত্থং চেতস্তেতয়ো র্দোলয়ন্ যৎ কামো বামোহপ্যন্তরায়ং ন চক্রে।
লীলাশক্তেরের তত্র প্রভাবঃ কোহপ্যোজস্বী হেতুরিত্যাহুরার্য্যাঃ॥

টীকা—বামঃ প্রতিকুলঃ কামঃ ইত্থমনেন প্রকারেণ এতয়োশ্চিত্তং দোলয়ন্ যৎ অন্তরায়ম্ ন চক্রে তত্র লীলাশক্তেরেব কোহপি ওজস্বীপ্রভাব এব হেতুঃ ইতি আর্য্যা আহুঃ॥

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর রূপ লহরী দোলায় নয়নকমল দোলাচ্ছেন বটে, কিন্তু লীলা প্রতিকূল কাম তাঁদের উভয়ের চিত্তসরোজকে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত করেও হিন্দোলালীলার কিছুমাত্র অন্তরায় ঘটাতে পারল না। আর্য্যগণ বলেন লীলাশক্তির অনির্ব্বচনীয় ওজস্বী প্রভাবই এর হেতু।

২৯। দোলারজ্জ্বালম্বশাখে স্বলৌল্যাদেতৌ চঞ্চৎ পঞ্চশাখাগ্রাগাভিঃ।
পুষ্পাঢ্যাভিঃ পল্লবালীভিরিষ্টৈঃ সেবেতে স্মামোদনৈবীজনৈঃ কিম্।।

টীকা—উৎপ্রেক্ষামাহ। দোলা সংযুক্তরজ্জোরালম্বনে দ্বে শাখে কর্ত্তৃভূতে স্বস্য পল্লবালীভিঃ এতৌ রাধাকৃষ্ণৌ কর্ম্মভূতৌ কিম্ আমদনৈঃ সুগন্ধ—বিশিষ্টৈর্বীজনৈঃ সেবেতে। কথম্ভূতাভিঃ স্বস্যাশাখায়া লৌল্যাদ্ধেতোশ্চঞ্চল বিস্তারযুক্তশাখায়া অগ্রগাভিঃ। শ্লেষেণ পঞ্চশাখা এব পঞ্চশাখঃ পাণি। পচি বিস্তারে ধাতুঃ।

অনুবাদ—যে তরুশাখা যুগলে দোলার রজ্জু সংযুক্ত আছে সেই শাখাদ্বয়ও দোলার বেগে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল যেন সেই শাখাদ্বয় সেবাপরা সখী যুগলরূপে স্বীয় করাগ্রবর্ত্তি বিস্তারযুক্ত পুষ্পভূষিত পল্লবরাজিরূপ সুরভি ব্যজন দ্বারা শ্রীরাধাশ্যামের সেবা করছে।

৩০। তত্তৎপত্রাল্যান্তরানন্তশিল্প প্রোতান্ ধর্ত্তুং চঞ্চলান্ মাল্যখণ্ডান্।
যত্নৈর্ভৃঙ্গানাশকন্ যদ্ভ্রমন্ত স্তত্রাগুঞ্জন কেবলং সাপি শোভা॥

টীকা—তত্তচ্ছাখাস্থপত্রশ্রেণীনাং মধ্যে মধ্যে বহুশিল্পেন। প্রোতান্ মাল্যখণ্ডান্ হিন্দোলয়া সহ দোলতস্তান্ ভৃঙ্গা ধর্ত্তুং নাশকান্ কিন্তু ভ্রমন্তঃ সন্তস্তত্র কেবলম্ অগুঞ্জন্ অতএব মাল্যানাং পশ্চাৎ ভ্রমরাণাং ভ্রমণরূপা সা শোভাপি॥

অনুবাদ—সেই তরুশাখাস্থিত পত্র কিশলয়ের মাঝে মাঝে অনন্তশিল্প কলা কৌশলে গ্রথিত চঞ্চল মাল্যখণ্ড সকল হিন্দোলার সহিত দুলিতেছে। প্রমত্ত ভৃঙ্গনিচয় তাহা ধরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেও ধরতে পারছে না। ভ্রমণ করতে করতে কেবল তথায় গুঞ্জন করে বেড়ালে লাগল। আমরি! মাল্যখণ্ডের পশ্চাতে পশ্চাতে গুঞ্জনশীল ভ্রমরের ভ্রমণ তখন বাস্তবিক অনুপম শোভার সৃষ্টি করল।

৩১। দোলাবেগাধিক্যকামৌ স্বপদ্ভ্যামাক্রম্যৈতাং স্বাবানত্যুন্নতিভ্যাম্।
স্বং স্বং সর্ব্বাঃ কৌশলং দর্শয়ন্তৌ প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুস্তৌ॥

টীকা—দোলাবেগস্যাধিক্যকামৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অতএব স্বপদ্ভ্যাং দোলাম্ আক্রম্য স্বস্যাবনত্যুন্নতিভ্যাং স্বং স্বং কৌশলং সর্ব্বাঃ সখ্যঃ দর্শয়ন্তৌ প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুঃ॥

অনুবাদ—দোলা অপেক্ষাকৃত অধিকবেগে দোলাবার অভিলাষে শ্রীরাধাশ্যাম পদযুগল দ্বারা দোলা আক্রমণ পূর্ব্বক দেহের অবনতি ও উন্নতি দ্বারা স্ব স্ব দোলন কৌশল দেখিয়ে সখীগণকে প্রেমানন্দে বিভোর করলেন।

৩২। হিন্দোলায়া রংহসী বিন্দমানে পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ স্তৌ যদন্তৌ।
প্রাপ্যোর্দ্ধাধঃ স্থায়িনোঃ খেলতোঃ সা যূলোঃ কান্তিঃ কৌতুকং কাপি তেনে॥

টীকা—হিন্দোলায়া রংহসী বেগৌ পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ বিন্দমানে প্রাপ্নুবত্যৌ স্তঃ। যস্য বেগস্য দ্বৌ অন্তৌ প্রাপ্য উর্দ্ধাধঃ স্থায়িনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ যূনোঃ সা প্রসিদ্ধা কাপি কান্তিং কৌতুকং তেনে॥

অনুবাদ—শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর অভিমুখে দোলার উপর উপবেশন করেছেন। দোলা পর্য্যায়ক্রমে দুদিকে বেগে দুলছে। বেগের অন্তসীমা প্রাপ্ত হয়ে দোলা যেমন উর্দ্ধগত হচ্ছে অমনি একবার শ্রীরাধার নীচে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যবার শ্রীকৃষ্ণের নীচে

শ্রীরাধা থাকছেন। এইরূপক্রীড়াপর যুবক-যুবতীর শোভা তখন সখীদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব কৌতূক বিস্তার করতে লাগল।

৩৩। রাধাহারং সংস্পৃশন্ কৃষ্ণবক্ষশ্চক্রে নৃত্যান্যকতো দিশ্যুদারম্।
অন্যত্রাস্যাঃ কঞ্চুকীং শ্লিষ্যতি স্ম স্রক্ তস্যা পীত্যা যযুর্মোদমাল্যঃ॥

টীকা—একতো দিশি নৃত্যানি চক্রে। অন্যত্র দিশি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যপি॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ নিম্নদিকে থাকবার সময় শ্রীরাধার হার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ স্পর্শ করে একদিকে নাচতে লাগল। এবং শ্রীরাধা নিম্নদিকে থাকবার কালে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তী মালা শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা স্পর্শ করে সুন্দরভাবে নৃত্য করতে লাগলেন। আহা! সে মনোহর দৃশ্য দেখে সখীগণ পরমানন্দ লাভ করতে লাগলেন।

৩৪। অন্যোহন্যাঙ্গাদর্শ দৃষ্টস্বভাসোরন্যোহন্যানালোকজ কান্তিভাজোঃ।
তর্হান্যোন্য শ্বাসভুমাভিবর্ষাদন্যোন্যং সন্দৃশ্য তৌ হৃষ্যতঃ স্ম॥

টীকা—পরস্পরাঙ্গরূপাদর্শে দৃষ্টা স্বকান্তির্য্যাভ্যাং তথাভূতয়োঃ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে উৎকণ্ঠিতা রাধা তস্যাঙ্গে স্বমেব পশ্যতি ন তু কৃষ্ণম্। এবং শ্রীকৃষ্ণোহপি এবং ক্রমেণ পরস্পরানালোকেন জন্য দুঃখভাজো স্তয়োস্তদানীমেব বিরহদুঃখেনান্যোন্যশ্বাস ভূমস্পর্শাৎ পরস্পরং সাদৃশ্য তৌ হায্যতেঃ স্ম। শ্বাসেনাঙ্গরূপদর্পণস্যাবরণাৎ প্রতিবিম্বো ন দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ॥

অনুবাদ—আমরি! ঐ দেখ দোলার ওপর মরকত মুকুরের সম্মুখে মনোহর কনকমুকুর কেমন অপূর্ব্ব শোভা পাচ্ছে। কান্ত দর্শনোৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গমুকুরে নিজেরই শ্রীমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ কনকগৌরী শ্রীরাধাঙ্গমুকুরে নিজ নটবরমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখতে পেলেন না। এইরূপে পরস্পরের অদর্শনে পরস্পরের হৃদয়ে দুঃখানল ধূমায়িত হয়ে উঠল উদ্দীপ্ত বিরহের মর্ম্মাদাহী দুঃখে যেন উভয়ে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলেন অমনই উভয়ের স্বচ্ছ শ্রীঅঙ্গদর্পণ বিষাদের ছায়াপাতে ঈষৎ মলিনভাব ধারণ করল। তখন আর পরস্পর প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন না। উভয়ে উভয়কে দেখে হর্ষমুগ্ধ হলেন।

৩৫। ইত্থং লীলাবারিধিঃ কৌতুকিত্বাদত্যুদ্রেকং রংহসো নির্ম্মিমাণ।
পৃষ্টামৃষ্টোত্তুঙ্গ পর্য্যন্ত শাখাপত্রালীকাং তাং চকারেব ভীতাম্॥

টীকা—ইত্থং লীলাবারিধিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কৌতুকীত্বাৎ বেগস্যাত্যুদ্রেকং নির্ম্মিমাণঃ স

তাং রাধাং ভীতং চকার। কথম্ভূতাং বেগস্যাধিকাৎ পৃষ্ঠদেশেন আমৃষ্টা উত্তুঙ্গান্তশাখায়াঃ পত্রশ্রেণী যয়াঃ॥

অনুবাদ—এইরূপে লীলালাগর শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক পরবশ হয়ে দোলার বেগ বৃদ্ধি করে যেমন দোলা দোলাতে লাগলেন অমনি বেগাধিক্যবশতঃ দোলা ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হতে লাগল। তাতে অতি উচ্চ নীপশাখার পত্রশ্রেণী শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করায় কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা পতনাশঙ্কায় অতিমাত্র ভীতা হলেন।

৩৬। মৈবং মৈবং মাধিকং হন্ত দোলেত্যুক্তিং তস্যাস্তং সখীনাঞ্চ শৃণ্বন্।
স্মিত্বা স্মিত্বা বর্দ্ধয়ন্নেব দোলা জঙ্ঘালত্বং মাধবো ভ্রাজতে স্ম॥

টীকা—হে কৃষ্ণ! ত্বম্ এবং মা দোলা দোলায়াঃ জঙ্ঘালত্বং বেগবত্বং বর্দ্ধয়ন্।

অনুবাদ—শ্রীরাধাকে ভয়বিহ্বলা দেখে সখীগণও অত্যন্ত শঙ্কাকুলা হলেন এবং কম্পিতকণ্ঠে 'এরূপভাবে দোলাইও না ওহে নিষ্ঠুর'। হায়! তাতে শ্রীরাধা অত্যন্ত ব্যাকুলা হলেন। তাঁরা বার বার বলতে লাগলেন 'ক্ষান্ত হও, এমনভাবে আর দুলিও না'। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ শুনে নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাক হাসতে হাসতে দোলার বেগ আরও বাড়াতে লাগলেন।

৩৭। বন্ধাদ্বেণী বিচ্যুতা নাবগুণ্ঠস্তস্থৌ মুর্দ্ধিণ ব্যস্ততাভুষণানাম্।
পাদৌ শাটী নাপ্যধাদিত্যমুষ্যা বৈয়গ্র্যেহা জাহসীতি স্ম কৃষ্ণঃ॥

টীকা—মূর্দ্ধি অবগুণ্ঠনঃ ন তস্থৌ। বায়ুনা অন্তরীণ বস্ত্রস্যোত্তলনা শঙ্কয়া পদ্ভ্যামাক্রান্ত্যো যা শাটী সাপি পাদৌ নাধ্যপাৎ ন আচ্ছাদিতবতী ইতি অমুষ্যা রাধায়া বৈয়গ্র্যে হা খেদে কৃষ্ণো জাহসীতি স্ম পুনঃ পুনঃ হাস্যংচকার।

অনুবাদ—মস্তকের বেণীবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল; অবগুণ্ঠনও আর রইল না। ভূষণ সকলও বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। বায়ু ভরে অন্তরীণ বসন পাছে উড়ে পড়ে এই আশঙ্কায় পদযুগল দ্বারা যে শাটী চেপে ধরেছিলেন তখন তাও আর সেইভাবে ধরে রাখতে পারলেন না। শ্রীরাধার সেই বিবশ ব্যাকুল অবস্থা দেখেও বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ হাস্য করতে লাগলেন।

৩৮। ইত্থং স্বাঙ্কোোস্তুপ্যতো রংহসা তাং বিত্রস্তাক্ষীমাসনাদ্রং শয়িত্বা।
স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস মধ্যে দোলা খট্বং তাঞ্চ জগ্রাহ দোর্ভ্যাম্॥

টীকা—কৃষ্ণ ইত্থম্ অনেন প্রকারেণ স্বস্যাঙ্কোোস্তুপ্যতোঃ সতীঃ বেগেন বিশ্রস্তাক্ষীং

তাম্ আসনাদ্ ভ্রংশ্রযিত্বা স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস। স্বয়মেব দোলা খট্টায়া মধ্যে তাং রাধাং দোর্ভ্যাং জগ্রাহ। কিন্তু কৃষ্ণঃ রজ্জুং বিহায় স্বচরণয়োরবলম্বমাত্রেণৈব দোলা মধ্যে তস্থাবিতি তস্য সামর্থ্যাতিশয়ো রঞ্জিতঃ॥

অনুবাদ—শ্রীরাধার সেই ভীতি বিহ্বল অবস্থা দেখেও নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ নিজ নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করতে করতে ক্রমশঃ দোলার বেগ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। তাতে বিত্রস্তনয়না শ্রীরাধা নিজাসন হতে পরিভ্রষ্ট হয়ে স্বীয় বাহুবল্লী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করলেন। অমনি শ্রীকৃষ্ণ দোলা রজ্জু পরিত্যাগ করে দুই হাত দ্বারা ভীতা রাধাকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করে কেবল পদকমল দ্বারা মাত্র অবলম্বনেই সেই বেগবতী দোলার উপর অবস্থান করতে লাগলেন। অহো! শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেমন বিচিত্রা তাঁর সামর্থ্যও তেমনি অপরিসীম।

৩৯। একীভূতে চম্পকেন্দীবরাভে মূর্তী যুনোরুদ্গিরন্ত্যাবভাতাম্।
সংমর্দ্দোত্থং সৌরভং ব্যাপ্লুবানং পারে স্বর্গং হন্ত পদ্মাদিনাসাঃ॥

টীকা— চম্পকেন্দীবর পুষ্পয়োরিব আভা যয়োরেবম্ভূতে যূনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ মূর্তী নিবিড়সংয়োগাদেকীভূতে অতএব পুষ্পয়োরিব সংমর্দ্দোত্থং সৌরভং উদ্গীরন্তৌ অভূতম্। সৌরভং কথম্ভূতম্ স্বর্গস্য পারে স্থিতানাং পদ্মাদীনাং নাসাঃ ব্যাপ্লুবান্।

অনুবাদ—আমরি! মরি! এরূপে দোলার ওপর তখন শ্রীমূর্তিযুগল নিবিড় আলিঙ্গ ন পাশবদ্ধ হয়ে যেন দুটিতে একটি হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। কি সুন্দর! যেন একবৃন্তে বিকসিত চম্পক ইন্দীবর নিবিড় সংযোগে একীভূত হয়ে মারুত হিল্লোলে দুলে দুলে এক অনুপম মঞ্জু সুষমা বিকাশ করছে। উভয়ের সম্মর্দ্দ নিবন্ধন উক্ত কুসুম সদৃশ সৌরভ উদ্গীর্ণ হয়ে স্বর্গের পারে বৈকুণ্ঠ বিহারিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির ঘ্রাণেন্দ্রিয়কেও ব্যাপ্ত ও প্রমোদিত করল।

৪০। সাম্যদ্বেগা সা সমন্তাদ্ধৃতাভূদ্দোলাপ্যারাদাগতাভিঃ সখীভিঃ।
রাধাদ্রাগে বাবরুহ্যাথ তস্যাস্তভিস্ততৎ সংলপন্তী ললাষ॥

টীকা—অবলম্বনং বিনা দোলাপরি স্থিতৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ আরাদ্দুরা দেবাগতাভিঃ সখীভিঃ ধৃতা সা দোলা সম্যদ্বগা অভূৎ। প্রথমতো রাধা তস্যাঃ দোলায়াঃ সকাশাৎ অবরুহ্যতাভিঃ সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণ কৃততত্ত্বৃতান্তঃ সংলপন্তী সতী ললাষ লষকান্তৌ।

অনুবাদ—শ্রীরাধাশ্যাম দোলার ওপর বিনা অবলম্বন অবস্থান করেছেন। সখীগণ দূর হতে তা দেখতে পেয়ে সেখানে এলেন এবং দোলা ধারণ করবামাত্র দোলার বেদ সংযত হল। শ্রীরাধাই আগে দোলা থেকে নেমে সখীদের কাছে কৃষ্ণকৃত বিড়ম্বনার

বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন। তৎকালে তাঁর অনবদ্য শোভা মাধুরী চারিদিকে উৎসারিত হয়ে পড়ল।

৪১। মুখ্যা স্বষ্টাস্বাদ্যভূতামথালীমারোহ্যাস্যাং তাং স কৃষ্ণাং স্বয়ং সা।
পেম্না গায়দ্দোলয়ন্তী স চাপি প্রেয়ান্ দোলে পূর্ব্ববত্তামজৈষীৎ॥

টীকা—অষ্টাসু মুখ্যাসু সখীষু মধ্যে প্রধানীভূতাং তাং ললিতাং শ্রীকৃষ্ণেণ সহিতাং সা রাধা স্বয়ং দোলয়ন্তী সতী অগায়ৎ। স চ প্রেয়ান্ কৃষ্ণোহপি দোলনে পূর্ব্বৎ রাধামিব তাং ললিতামজৈষীৎ॥

অনুবাদ—পরে অষ্টসখীর শিরোমণি শ্রীললিতাকে শ্রীরাধা কৌশলক্রমে দোলার ওপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করিয়ে স্বয়ং তাঁদের দোলাতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে প্রেম ভরে গান করতে লাগলেন। নাগরবর শ্রীকৃষ্ণও ইতঃপূর্ব্ব দোলার ওপর শ্রীরাধার যেমন অবস্থা করেছিলেন সেইরূপ ললিতারও করলেন।

৪২। এবং প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদিকালীঃ সান্দ্রং দোলান্দোলমাপয্যতস্যাম্।
হিন্দোলাতঃ সোহবতীর্য্যের সর্ব্বা দ্বৈকৈকস্যমন্য হিন্দোলিকাসু॥

টীকা— এবং প্রকারেণ ললিতাবৎ প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদিকালীঃ সান্দ্রং দোলান্দোলনমাপয্য তস্যা হিন্দোলাতঃ সকাশাৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ অবতীর্য্য সর্ব্বাসু প্রধানাতিরিক্তান্য হিন্দোলিকাসু মধ্যে একৈকস্যাঃ হিন্দোলায়াং দ্বে দ্বে সুন্দর্য্যৌ প্রসহ্য বলাৎ মহ্যাঃ সকাশাৎ স্বদোর্ভ্যাং আগৃহ্য তত্র দোলায়ামারোহ্য এক এব কৌশলে বিশেষেণ ভ্রাম্যন্ সন্ তাঃ সমস্তাঃ সখীঃ অদোলয়ৎ। ননু বহ্বায়াসসাধ্যে অস্মিন্ কর্মণি কথং প্রবৃত্তি তত্রাহ প্রেমসমুদ্রস্য কৃষ্ণস্য কিমকৃত্যমস্তি?

অনুবাদ—এইরূপে বিশাখাদি সকল প্রিয়সখীকেই হিন্দোলায় আন্দোলিত করে ললিতার ন্যায় সান্দ্র সরস অবস্থা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা হতে অবতরণ করলেন। এই প্রধান হিন্দোলা ব্যতীত অন্য যে সকল হিন্দোলার কথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে একটি হিন্দোলার উপরে নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ দুটি দুটি ব্রজসুন্দরীকে বলপূর্ব্বক ভূমিতল হ'তে স্বীয় ভুজযুগল দ্বারা গ্রহণ করে আরোপণ করলেন এবং একাকীই কৌশলবিশেষ দ্বারা সমস্ত দোলার ওপর ভ্রমণ করে সখীগণকে দোলাতে লাগলেন। যদি বল এরূপ বহু আয়াস সাধ্য কর্মে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে প্রবৃত্ত হলেন? এটি বিচিত্র নয়। প্রেমরত্নাকর ব্রজসুন্দরের অকরণীয় কি আর আছে? তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সবই করতে পারেন।

৪৩। তাংসাং দ্বে দ্বে সুন্দরীণাং স্বদোর্ভ্যাং স্বদোর্ভ্যাং তত্রাগৃহ্য
রোহ্যমহ্যাং প্রসহ্য।
ভ্রাম্যন্নেকো দোলায়ন্ত্যঃ সমন্তাঃ প্রেমাম্ভোধেস্তস্য কিং ব্যস্ত্যকৃত্যম॥
[যুগ্মকম্]

৪৪। তাঃ সর্ব্বাস্তু স্ব স্ব হিন্দোলিকান্ত স্তঞ্চাপশ্যন্ স্ব স্ব বক্তুং ধয়ন্তম।
নৈতচ্চিত্রং গোকুলাধীশসুনোরিচ্ছাশক্তেঃ কিং পুনঃ স্যাদশক্যম॥

টীকা—অহমপি দ্বয়োর্দ্বয়ো মধ্যে তিষ্ঠামীতি শ্রীকৃষ্ণস্য মনোগত সিদ্ধিমাহ সর্ব্বাঃ সখ্যঃ স্ব স্ব হিন্দোলা মধ্যে স্ব স্ব বক্তং পিবন্তং তং কৃষ্ণম্ অপশ্যান্॥

অনুবাদ প্রত্যেক হিন্দোলার ওপর গোপাঙ্গগণাযুগলের মধ্যে আমিও অবস্থান করব এই ভাব যেমন শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে উদিত হল অমনি তা সিদ্ধ হয়ে গেল। কারণ তখনই সে সকল ব্রজসুন্দরী স্ব স্ব হিন্দোলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বদনাম্বুজ মধুপান করছেন দেখতে পেলেন। ইহা ব্রজেন্দ্র নন্দনের সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কারণ তাঁর ইচ্ছা শক্তির কাছে কিছুই অসম্ভব হতে পারে না।

৪৫। একং তত্রৈবাস্তি হিন্দোলনাব্জং বৃন্দোদ্দিষ্টং প্রেয়সীভির্মুকুন্দঃ।
আরুহ্যৈতৎ কর্ণিকাস্থোপবর্হালম্বী দোষাশ্লিষ্টরাধো ররাজ॥

টীকা—অধুনা কমলাকারহিন্দোলাং বর্ণয়তি। একং হিন্দোলাব্জং তত্রৈবাস্তি। বৃন্দায়া উদ্দিষ্টং তৎ প্রেয়সীভিঃ সহ মুকুন্দঃ আরুহ্য ররাজ। কথম্ভুতঃ দোষা বামস্কেন আশ্লিষ্টা রাধা যেন॥

অনুবাদ—অতঃপর তথায় যে কমলাকৃতি হিন্দোলা ছিল তা বৃন্দাদেবী দেখিয়ে দিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের সঙ্গে তার ওপর আরোহণ করলেন এবং সেই হিন্দোলা কমলের কর্ণিকায় আস্তৃত সুকোমল কুসুম শয্যার ওপর শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করে শ্রীরাধার স্কন্ধে বাম বাহু অর্পণ করে বিরাজ করতে লাগলেন।

৪৬। অষ্টাবাল্যোঽপ্যষ্টপত্রান্তরস্থা স্তত্ত্বাহ্যো ষোড়শাল্যো বিভান্তঃ।
বৃন্দানীত স্বাদু খর্জ্জুরজম্বূ দ্রাক্ষাঃ প্রাশন্ কান্তভুক্তাবশিষ্টাঃ॥

টীকা—অষ্টৌ ললিতাদ্যালঃ অষ্টদলানাং মধ্যস্থাঃ তত্তদষ্টদলানাং বহিঃ ষোড়শদলেষু অন্যাঃ ষোড়শাল্যো বিভান্ত্যঃ সত্যঃ কান্তাভ্যোং ভুক্তাবশিষ্টাঃ প্রাশ্নন্।

অনুবাদ—এই হিন্দোলাব্জের অষ্টদলে ললিতাদি অষ্টসখী এবং অষ্টদলের বাইরে ষোড়শদলে অপর সখী অপূর্ব শোভাময়ী রূপে বিরাজ করতে লাগলেন। তদ্দর্শনে

বৃন্দাদেবী পরমানন্দে খর্জুর জম্বু দ্রাক্ষা প্রভৃতি বিবিধ উপদেয় ফল এনে ভোজনের জন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট দিলেন। তাঁদের ভোজনান্তে যা অবশিষ্ট রইল সখীগণ তা হৃষ্টচিত্তে ভোজন করলেন।

৪৭। পীযূষান্তর্গর্ব্ব সর্ব্বঙ্কষস্য প্রাগে বাভূৎ পানকাদেঃ প্রপানম্।
অন্তে হেমদ্যোতি তাম্বুলবীটী বৃন্দান্যোহন্যো প্রীতিদানাভিযোগঃ॥

টীকা—খর্জ্জুরাদি ভোজনাৎ প্রাগেব পানকাদেঃ প্রপানমভূৎ। কথম্ভূতস্য পীযূষস্য যোঽন্তর্গর্বস্তস্য সর্বঙ্কষস্য নাশকস্যেত্যর্থঃ। ভোজনান্তে সুবর্ণ-তুল্যতাম্বুলবীটীসমূহস্য পরস্পর প্রত্যাদানেন সহাভিযোগঃ গ্রহণম্।

অনুবাদ—উহারা খর্জ্জুরাদি ফল ভক্ষণের পূর্বে হিন্দোলায় উপবেশন করেই অমৃত গর্বনাশক সুস্নিগ্ধ পানকাদি পান করেছিলেন। এখন ভোজনাবসানে সুবর্ণকান্তি তাম্বুলবীটিকা সকল পরস্পর প্রীতির সহিত আদান প্রদান করতে লাগলেন।

৪৮। নান্দী বৃন্দেবিন্দতঃ স্ম প্রমোদং নোদং পান্যোর্দোলনাজে দদত্যৌ।
দাস্যেঽপ্যাস্যোল্লাসমাপদ্য সদ্যো নানাগানারম্ভশম্ভা বভূবুঃ॥

টীকা—তদ্দর্শনাৎ নান্দীবৃন্দে আনন্দং বিন্দতঃ স্ম। কীদৃশ্যৌ পাণ্যোর্নাদং প্রেরণং দোলনাজে দদত্যৌ। দাস্যোঽপি আস্যোল্লাসমাপদ্য নানাগানারম্ভেণ শম্ভাঃ আনন্দযুক্তা বভূবুঃ। শংশব্দাৎ ম প্রত্যয় ঃ।

অনুবাদ—এদিকে নান্দী ও বৃন্দা হিন্দোলা কমলের দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে পূর্ব্ববৎ হস্ত দ্বারা দোলাতে দোলাতে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। সে আনন্দলীলা দর্শনে কিঙ্করীগণেরও বদন কমলে উল্লাস মাধুরী তরঙ্গায়িত হয়ে উঠিল। তাঁহারা তখন বীণানিন্দিত কণ্ঠে নানাবিধ সঙ্গীতালাপ করিতে করিতে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন।

৪৯। দোলান্দোল ক্রীড়য়া তাঃ সমস্তাঃ জিত্বা প্রাপ্তাশ্লেষাচুম্বাদিরত্ন।
সার্দ্ধাৎ কান্তামণ্ডলেনাবরুহ্য প্রাগাৎ প্রেয়ান্ কাননাৎ কাননায়॥

টীকা—তা জিত্বা প্রাপ্তম্ আশ্লেষচুম্বানানি রত্নাং যেন তথাভূতঃ কান্তামন্তলেন সহ হিন্দোলাৎ অবরুহ্য এতৎ কাননাৎ অন্য কানকায়।

অনুবাদ— এইরূপে শ্রীশ্যামসুন্দর হিন্দোলা লীলা দ্বারা সেই সকল সখীকে জয় করে চুম্বনালিঙ্গনাদি রত্ন লাভ করলেন। আমরি! এ লীলারণে শ্যামকিশোরেরই জয় ঘোষিত হইল, অনন্তর তিনি দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সেই লীলাশক্তিরূপিণী কান্তামণ্ডলীর সহিত হর্ষ ভরে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৫০। রাধাস্যোত্থা মুদ্রিতা যা স্মিতশ্রীস্তস্যাস্তত্র স্মরে কানেব দৃষ্টা।
যূথ্যালীনাং কোরকান্ স ব্যচৈষীৎ হৃদ্যাধাতুং তান্ স্রজঃ সংচ্চয্য॥

টীকা—পুনর্বর্ষা ঋতুং বর্ণয়তি। রাধিকায়া আদৌ মুখাদুত্থিতা পশ্চাদবহিত্থয়া মুদ্রিতা যা স্মিত শ্রীস্তস্যাঃ স্মারকান্ যূথীপুষ্পানাং কোরকান্ দৃষ্টা সঃ কৃষ্ণঃ তান্ কোরকান্ স্রজঃ সংরচর্য্য হৃদি আধাতুং ব্যচৈষীৎ চয়নং চকার। তথা চ তন্মিষেণ রাধায়াঃ স্মিতমেব হৃদি দধারেতি ভাবঃ।

অনুবাদ— ভ্রমণ করতে করতে যুথীকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন বর্ষাজাত স্ফোটনোন্মুখ যূথিকাকুসুমকোরক সকল এক অপূর্ব সুষমা উৎপাদন করেছে। মরি! মরি! সে শোভন মাধুরী দেখে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপটে শ্রীরাধার মঞ্জুস্মিত শ্রী উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন শ্রীরাধার শ্রীমুখকমলে মৃদু হাস্য বিভা উত্থিত হয়ে অবহিত্থাবশতঃ পুনরায় মুদ্রিত রয়েছে। এই শোভা মাধুর্য্যই তখন সেই যূথিকা কোরক নিচয় শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে স্মরণ করিয়ে দিল। অমনই শ্রীকৃষ্ণ সেই যূথিকা কোরক সমূহের মালা গেঁথে হৃদয়ে ধারণ করাবার জন্য তা চয়ন করতে লাগলেন এবং এইরূপে যূথিকাকোরকের মালা ধারণ ছলে শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধার মৃদু হাসি হৃদয়ে ধারণ করে রাখলেন।

৫১। খেহগান্মেঘঃ কৃষ্ণগাত্রছবিত্বং বিদ্যাত্তাশামঙ্গভাষা ততিত্বম্।
ভূমেরূঢ়ৈরিন্দ্রগোপৈঃ সমূঢ়ৈ পাদালক্তাভ্যক্ততা ব্যক্তমাসীৎ॥

টীকা— খে আকাশে যো মেঘঃ স কৃষ্ণস্যাঙ্গচ্ছবিত্বগাৎ প্রাপ্তবান্। ন তু মেঘস্য কৃষ্ণাঙ্গচ্ছর্ব্যতিরিক্তপদার্থত্বমিতিভাবঃ। এবং বিদ্যুৎ তাসামঙ্গ কান্তিসমূহত্বমগাৎ। এবং ভূমেঃ সকাশাৎ উৎপন্নৈঃ সমূঢ়ৈঃ সমূহ্যবিশিষ্টৈঃ ইন্দ্রগোপৈঃ রক্তকীটবিশেষৈঃ করণৈঃ পাদালক্তস্যাভিব্যক্ততা স্ফুটমাসীৎ। তথা চ তন্মিষেণ পাদাসক্ত এব ভূম্যাং বিরাজতে। ইতি সর্বত্রাপহ্নুত্যলঙ্কারো বোধ্যঃ।

অনুবাদ— অহো! বর্ষা সমাগমে গগনশোভি জলদনিচয় শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি লাভ করে শোভা পেতে লাগল। যেন শ্রীকৃষ্ণকান্তি ভিন্ন তাদের স্বতন্ত্র সত্তাই নেই। আবার সেই নব জলদ অঙ্কে দামিনীমালা যেন সঙ্গিনী ব্রজগোপীদের অঙ্গকান্তিরূপে উদ্ভাসিত এবং ভূমিতল ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ বর্ষাকীট সমূহ সেই ব্রজাঙ্গনাদের শ্রীচরণের অলক্তকরাগরূপে প্রতিভাত হতে লাগল।

৫২। কৃষ্ণাভ্রেণাতুলঘনরসৈঃ সর্ব্বতো বৃষ্যমাণৈ রত্যুৎফুল্লাঃ কিল
সুমনসঃ পর্ব্ববত্যো লতাশ্চ।

তৎসস্যাল্যোঽপ্যসমসুষমাঃ শং চিরায়ান্বভুবন্ বর্ষাহর্ষং বনমপি যতোহর্ষবর্ষাস্বমাঙ্ক্ষীৎ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে হিন্দোলান্দোলন সুখাস্বাদনো নামৈকাদশঃ সর্গঃ।

টীকা—কৃষ্ণবর্ণমেঘেন অতুলঘনরসৈঃ জলৈঃ করণৈঃ সুমনসো মালত্যো লতাশ্চ অত্যুৎফুল্লাঃ এবং পর্ব্বত্য গ্রন্থিমত্যঃ তথা সস্যাল্যোঽপি তত্তৎ বৃক্ষফলশ্রেণ্যোঽপি অসমসুষমাঃ সত্যঃ চিরায় শং সুখমন্বভুবন্, বৃক্ষাদীনাং ফলম্ সস্যমিত্যমরঃ। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপমেঘেন অতুলশৃঙ্গাররসৈঃ করণৈঃ সস্যাল্যাঃ প্রশস্তসখ্যাং রত্যুৎফুল্লাঃ সুমনসঃ শোভনচেতনঃ ফলং পর্ববত্যঃ উৎসববত্যঃ রলয়োরৈক্যাৎ লতাঃ রতাশ্চ সত্যং চিরায়া শং সুখম্ অন্বভুবন্ যতঃ শ্রীকৃষ্ণবিহারাৎ বর্ষাহর্ষবনমপি হর্ষাবর্ষাসু অমাঙ্ক্ষীৎ মমজ্জ॥

ইতি টীকায়ামেকাদশঃ সর্গঃ।

অনুবাদ—কৃষ্ণবর্ণ নবঘন সর্বত্র অতুল বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করতে লাগল। আর তাতে সুমনস অর্থাৎ মালতী ও ব্রততী শ্রেণী পরম উৎফুল্লা ও পরম পর্ববতী অর্থাৎ গ্রন্থিযুক্তা হল এবং তাদের সস্যালি অর্থাৎ সেই তরুলতাদির ফলশ্রেণীও অতুলনীয় সুষমাযুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী সুখানুভব করতে লাগল। অহো! যে ঘনরস বর্ষণে এই বর্ষাহর্ষবনও হর্ষবর্ষায় নিমগ্ন হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে কথিত হল যে শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ অতুল ঘনরস অর্থাৎ উজ্জ্বলরস সর্বত্র বর্ষণ করতে লাগলেন আর তাতে সস্যালি অর্থাৎ প্রশস্ত সখীগণ অত্যন্ত উৎফুল্লা সুমনস অর্থাৎ উৎসববতী ও রতা (লতা) অর্থাৎ অনুরাগিণী হয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপে সুখানুভব করতে লাগলেন। আমরি! ব্রজসুন্দরের এই মধুর লীলা বিহারে এই বর্ষাহর্ষ বনও হর্ষবর্ষার নিমগ্ন হয়ে গেল।

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে হিন্দোললীলা সুখাস্বাদন নাম একাদশ স্বর্গ॥

বিষয়বস্তু

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরম রসময়ী লীলা এই হিন্দোললীলা বা ঝুলন লীলা। রাধামাধবের লীলাকে মহাজন আট ভাগে ভাগ করেছেন—ভক্ত রসিক জন তাই অষ্টকালীনলীলা স্মরণ করে ধন্য হন, আনন্দিত হন—জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে সফল করেন। এটি তাঁদের নিগূঢ় ভজন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ তাঁর শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে এবং শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীপাদ তাঁর শ্রীশ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে এই অষ্টকালীনলীলা বর্ণনা করেছেন—রসিকসমাজে পরিবেশন করেছেন। এ হল তাঁদের অনবদ্য তো বটেই উপরন্তু অযাচিত করুণা। এই ঝুলন লীলা মধ্যাহ্ন লীলা এবং প্রাত্যহিক লীলা অর্থাৎ প্রতিদিনের লীলা।

আমাদের এ জগতে প্রতিদিন লীলার অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না বলে বছরে একবারই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকেন তা না হলে ঝুলনলীলা, দোললীলা (রং খেলা) পাশা খেলা—এ সবই রাধামাধবের প্রাত্যহিক লীলা অর্থাৎ প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এবং শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ নিজ নিজ অনুভবে লীলা আস্বাদন করেছেন। তাই দুটির মধ্যে একটু তারতম্য আছে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ ঝুলনলীলার আগে হোলীলীলা (হোরীলীলা) বর্ণনা করেছেন। রাধামাধব সখীগণ সমভিব্যাহারে হোলীলীলা আস্বাদন করেছেন—লীলা মানে খেলা। খেলায় যেমন হারজিৎ আছে লীলাতেও তাই। শ্রীজীবগোস্বামি পাদ বলেছেন হোলীলীলা নয় হোলীযুদ্ধ অর্থাৎ রং-এর যুদ্ধ। যুদ্ধে যেমন হারজিৎ আছে এখানেও তেমনি একদিকে রাধারাণী এবং সখীরা আর অন্যদিকে শ্যামসুন্দর। এখন এই রং-এর যুদ্ধে শ্যামসুন্দর হেরে গেছেন—বিশ্বজগৎ যাঁর চরণে লুণ্ঠিত হয় তিমি আজ রং-এর যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাধারাণীর অঞ্চল তলে মুখ লুকাচ্ছেন। লীলার এমনই মাধুরী। সখীরা হারুয়া নাগর বলে পরিহাস করছে। রাধারাণী সখীদের বলছেন—দ্যাখ, শ্যাম নাগর হেরে গিয়েছে বলে তাকে যেন তোরা কেউ কিছু বলিস্ না—দেখছিস্ না—আগেই তার মুখখানা লজ্জায় কালো হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় হঠাৎ শ্যামসুন্দর রাধারাণীর হাতের রং-এর পিচকারি আর রাধারাণী শ্যামসুন্দরের হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেন। কেউ আর কাউকে কোনটি ফিরিয়ে দেন না। কারণ একজন ফিরিয়ে দিলে আর একজন যদি না দেন। তখন স্থির হল হাতে হাতে দেওয়া হবে হাতে হাতে নেওয়া হবে। রাধারাণী এবং শ্যামসুন্দর সামনা সামনি দাঁড়ালেন। রাধারাণী ডান হাতে বাঁশী দেবেন আর গোবিন্দ বাঁ হাতে সেটি নেবেন।

এইভাবে যখন হাতে হাতে দেওয়া ও নেওয়াতে হাতে হাতে ঠেকেছে তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইঙ্গিতে কুন্দলতা, বৃন্দা, ললিতা রাধারাণীর কটিদেশ ধরে শ্যামসুন্দরের সামনের দোলনায় (হিন্দোলায়) রাধারাণীকে উঠিয়ে দিলেন। এইভাবে রাধারাণী দোলনায় উঠলেন এবং শ্যামসুন্দর তার সামনের দোলনায় উঠে হিন্দোলা লীলা আস্বাদন করেছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের আস্বাদনে একটু পার্থক্য আছে। এ তারতম্যের আর একটি কারণ বলা যায় কারণ ঝুলনলীলা হলেন প্রতিদিনের লীলা তাই তারতম্য স্বাভাবিক। কারণ প্রতিদিন তো লীলা একই ভাবে প্রকাশ পায় না। আর তা ছাড়া মহাজনেরও অনুভব ভিন্ন ভিন্ন সেই হিসাবেও তারতম্য হতে পারে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের আস্বাদনটি স্মরণ করব এবং ঝুলনলীলার পূর্বপ্রসঙ্গ যেভাবে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁর শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে আস্বাদন করেছেন—সেটি তাঁর কৃপা এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা স্মরণ করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রিকা

ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগে রাম শ্যাম গৌরাঙ্গ ভগবান এসে এ জগতে লীলা করেছেন। এর মধ্যে বলা আছে শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদাপুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলাপুরুষোত্তম এবং শ্রীগৌরাঙ্গ হলেন প্রেমপুরুষোত্তম। মর্য্যাদা লীলা প্রেমপুরুষোত্তম রাম শ্যাম গৌরাঙ্গ নাম ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হলেন লীলা পুরুষোত্তম। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবান শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠ ধাম থেকে ভূলোকে অবতীর্ণ হয়ে বিবিধ লীলা প্রকাশ করেন কেন? তার উত্তর শ্রীরাসলীলা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাবতশাস্ত্রে শ্রীশুকদেব দিয়েছেন।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

ভাঃ ১০।৩৩।৩৭

ভগবান ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে সকলকে অনুগ্রহ করবার জন্য গোলোক ধাম থেকে ভূলোকে এসে নানাবিধ লীলা প্রকাশ করেন তার একটাই কারণ এই লীলা কথারূপে জগতে প্রকাশিত থাকে এবং সেই লীলা কথার শ্রবণ কীর্ত্তন করতে করতে অনাদিকালের বিমুখতা নিয়ে আছে যে জীব তারা ভগবানের শ্রীচরণে উন্মুখ হবে। জীবের ভগবানকে মনে করাই স্বাভাবিক কিন্তু অনাদিকাল থেকে মায়ার আক্রমণে জীব ভগবানে বিমুখতা নিয়ে আছে। ভগবানকে ভুলে বসে আছে। এখন ভগবানকে মনে করবার উপায় কি? তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দ পরম করুণা করে ভূলোকে আবির্ভূত হয়ে নানা রসময়ী লীলা প্রকাশ করলেন। এই লীলা কথারূপে শাস্ত্রে ধরা রইলেন। মানুষ যতই এই লীলা কথা শুনবে বলবে অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন করবে ততই ভগবানে তাদের রুচি জাগবে। এইটি জীবের প্রতি ভগবানের পরম অনুগ্রহ। অন্নদান, বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান এসব আমাদের এ জগতে অনুগ্রহের মধ্যে গণ্য করা হয়—কিন্তু এ অনুগ্রহ হল আপাততঃ। কারণ এতে জীবের চিরকালের অভাব মিটছে না। ভগবানে উন্মুখতা জাগলে তার চিরকালের অভাব মিটে যাবে। কারণ জীবের মূল রোগ হল ভগবানে বিমুখতা—তাই নিদান ধরে চিকিৎসা করতে হবে। বিমুখতা যদি রোগ হয় তার

চিকিৎসা হবে উন্মুখতা এই উন্মুখতা জাগাবার জন্যই ভগবান ধরাধামে এসে লীলা প্রকাশ করেন। এখানে যে বলা হয়েছে মানুষং দেহমাশ্রিতঃ—মানুষদেহকে আশ্রয় করে ভগবান এলেন—এ মানুষ দেহ তাঁর নূতন ধারণ করা নয়। এ দেহ তাঁর নিত্য কালের। গোলোক বৈকুণ্ঠেও তাঁর মানুষ আকৃতি। কারণ বলা আছে।

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।

মানুষ আকৃতি তাঁর স্বরূপ তবে এ মানুষ দেহের উপাদান আর আমাদের মানুষদেহের উপাদান এক নয়। আমাদের দেহ রক্তমাংস মেদ মজ্জা অস্থি চর্মে গড়া আর ভগবানের দেহের উপাদান সৎ চিৎ আনন্দ—শুধু-সৎ-চিৎ আনন্দ নয় সৎ চিৎ আনন্দ ঘন। তাই ভগবানের লীলা কথার শ্রবণ কীর্ত্তনে জীবের কর্মবন্ধন খণ্ডন হয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবান সর্বরসের ভোক্তা। সর্বরস বলতে দাস্য সখ্য, বাৎসল্য মধুর এই চার প্রকার রসকে বুঝায়। আমাদের এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হলেন হিন্দোলা লীলা অর্থাৎ ঝুলনলীলা এটি মধুর রসের লীলা। মধুর রসকে বলা হয়েছে রসবিশেষ। দাস্য সখ্য বাৎসল্য—এই তিন রসের বৃত্তি সেবা নিঃসঙ্কোচ প্রীতি এবং দরদ মধুর রসে তো আছেই উপরন্তু মধুর রসের যে নিজস্ব বৃত্তি প্রণয় রস তাতো থাকবেই। অন্য রসের বৃত্তি মধুরে যাচ্ছে কিন্তু মধুররসের বৃত্তি যে প্রণয় রস তা কিন্তু অন্য রসে যাবে না। এই জন্যই মধুররসকে বলা হয়েছে রসবিশেষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা তিন জায়গায়ই লীলা করেছেন—কিন্তু বৃন্দাবন লীলাই সকলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ বৃন্দাবন অর্থাৎ ব্রজেই সকল রসের উৎকর্ষ। ভাব অনুযায়ী রসের প্রকাশ হয়। বৃন্দাবনে মধুররসের পরিকর হলেন রাধারাণী এবং ব্রজরামা। শ্রীকৃষ্ণ হলেন রস আর পরিকরেরা হলেন ভাব। বিচারে দেখান হয়েছে ব্রজের পরিকর সকলের উপরে। তাই মধুররসের পরিকর রাধা আদি ব্রজরামা—বৃন্দাবনে তাঁদের নিয়েই শ্রীগোবিন্দের এই ঝুলনলীলা। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই লীলা আস্বাদন করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ এ বড় দুষ্পাচ্য বস্তু। শাস্ত্রকার বলেছেন এ লীলা হলেন মুক্তগম্য অর্থাৎ মুক্তপুরুষ যাঁরা তাঁরাই এ লীলা আস্বাদনের অধিকারী। শ্রীহরিভজনের অধিকার কিন্তু সকলেরই আছে। কারণ শ্রীপ্রেমানন্দদাসজী বললেন—

শ্রীকৃষ্ণভজনে সবে অধিকারী কুলের গরব নাই।
প্রেমানন্দ কহে যে করে গরব নিতান্ত মুরখ ভাই।।

শ্রীশুকদেব বলেছেন—

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।

ন ভজেৎ সর্বতো মৃত্যুরূপাস্যমমরোত্তমৈঃ।।

ভাঃ ১১।২।২

কারণ দেহধারী প্রাণী সকলেই মৃত্যুভয়ে ভীত। এ মৃত্যুভয় নিবারণের একটাই উপায় অভয়ের পাদপদ্ম উপাসনা। অভয় তো একমাত্র গোবিন্দ। সুতরাং গোবিন্দ ভজন ছাড়া মৃত্যুভয় নিবারণ হবে না—যেমন আলো জ্বালা ছাড়া অন্ধকার দূর করবার আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু হরিভজন এবং তাঁর নিগূঢ় লীলা আস্বাদন—এ দুটির মধ্যে তফাৎ আছে। শুধু কৃষ্ণভজন এবং গোপীজনবল্লভের ভজন বিভিন্ন। শ্রীমদ্ভগবদগীতার কৃষ্ণ এবং ভাগবতের কৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ ভিন্ন। ভগবানের নিজ লীলা বুঝবার সামর্থ্য জীবের নেই কেন? তার কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চিদানন্দঘনবিগ্রহ। চিৎপুঞ্জের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কোথায়? চিৎকণের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ অণুচৈতন্য যে জীব সেই স্বরূপের বোধই আমাদের নেই। কাজেই চিৎ পুঞ্জের সঙ্গে তো আমাদের সম্বন্ধ হতেই পারে না। যেমন জলবিন্দুকে না জানলে সমুদ্রকে কিছুতেই বোঝা যায় না। নামাচার্য্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখনির্গলিত বাণী প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ের স্মৃতি থাকতে এ লীলা আলোচনার অধিকার হয় না।

তত্ত্বে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান—এই ভগবানের সকলের উপরে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ব্রহ্মকে বুঝতে পারাই কত কঠিন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হলেন ব্রহ্মঘনমূর্ত্তি। তাই চিৎ দেখলেও চিদঘন বস্তুকে উপলব্ধি করা যায় না। আবার কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝা তো বহুগুণে কঠিন। রাধাগোবিন্দের লীলা কথা শোনা এক জিনিষ আর সেই লীলাকথাকে পরম উপাস্য জেনে আস্বাদন করা আর এক জিনিষ। উপাস্য বোধে আস্বাদন না করলে লীলাকথা শ্রবণে আনন্দ হয় না। শ্রদ্ধাহীন হয়ে যদি লীলাকথা শ্রবণ করা যায় তাহলে মহা অপরাধ হয়। স্মরণে ভজনের জন্যই ভগবানের লীলা প্রকাশ এবং সেই লীলা কথারূপে থাকেন যার ফলে জীবের শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ আস্বাদন। তাই ভগবানের লীলা কথা শুনতে বসে যাতে প্রাকৃত বুদ্ধি না আসে এজন্য সাবধান হতে হবে। এইজন্য লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলা প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীশুকদেব ব্যক্ত করলেন—

ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ভাঃ ১০।২৯।১

এখানে 'ভগবান' কথাটি বলবার উদ্দেশ্য হল যে তিনি সর্বতোভাবে প্রাকৃত সম্পর্কশূন্য। কলিজীবের পাকস্থলী বড় দুর্বল। তাদের এ কৃষ্ণলীলা সন্ধানের সামর্থ্য তো নেইই, ইচ্ছাও নেই। কলিজীব আত্মসাক্ষাৎকারই করতে পারে না। কলিজীব ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে। ইন্দ্রিয়সুখে সদা বিভোর। তাই যাদের ইন্দ্রিয় দমন করে আত্মসাক্ষাৎকার হয়ে ওঠে না তাদের পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং তার লীলা উপলব্ধি তো সুদূর পরাহত।

শাস্ত্র বরাবরই প্রবৃত্তিমার্গের উপাসনাকে ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। উপবাসক্লিষ্ট জীব যেমন খাদ্য অন্বেষণ করে তেমনি গোবিন্দপাদপদ্ম মাধুর্য্যসম্ভোগ উপবাসী আমাদের আত্মাও খাদ্য অন্বেষণ করতে চায়। আত্মার এই উপবাস বহুদিন হতেই চলছে। প্রবৃত্তিমার্গ যেদিকে গিয়েছে খাদ্য তো সেদিকে নেই। তাই প্রবৃত্তিমার্গে গেলে খাদ্য পাওয়া যাবে না তাহোলে এখন প্রশ্ন হতে পারে শাস্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ করা হল কেন? প্রবৃত্তিমার্গে পরম্পরায় এবং নিবৃত্তিমার্গে সাক্ষাৎ ফললাভ হয়। মূর্খকে যেমন ছন্দানুরোধে উপদেশ করতে হয় তেমনি মূর্খ কলিজীবের প্রতি প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। ভগবৎ তত্ত্বানুভূতির ক্ষুধা জীবের চিরন্তন। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি অখাদ্যকে খাদ্য বলে গ্রহণ করে। তেমনি মায়াগ্রস্ত কলিজীবও খাদ্য হরিচর্য্যানুবর্ণন অর্থাৎ ভগবানের লীলা আস্বাদন ত্যাগ করে মায়া পরিবেশিত অখাদ্য খেতে আরম্ভ করেছে। ভগবানের লীলাকথা নিরন্তর বর্ণনা করতে হবে। দেবর্ষিপাদ নারদের দেওয়া এই একটি পথের সন্ধানই পাওয়া যায়। ভগবানের লীলা দেখতে যদিও প্রাকৃতের মত কিন্তু একে প্রাকৃত মনে করলে অপরাধ হবে।

শ্রীরাসলীলার শ্রবণ কীর্ত্তনের ফলশ্রুতি বলতে গিয়ে শ্রীশুকদেব বললেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।

ভাঃ ১০।৩৩।৪০

ব্রজবধূগণের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণের যে মধুর রসের লীলা সেই কথা যদি শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাস করে নিজ নিজ গুরুপাদ পদ্মের আনুগত্যে শ্রবণ কীর্ত্তন করা যায় তাহলে তার ভগবানে পরাভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধা নির্মলা ভক্তি তখুনি লাভ হবে এবং সে ধীর হবে তার হৃদয়ের সমস্ত কামনা বাসনা রোগ সমূলে বিনাশ পাবে। আলো জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন যতদিনের জমাট অন্ধকার

হোক মুহূর্তে দূরে সরে যায় একটুও দেরী হয় না এখানেও তেমনি ভগবানে পরাভক্তি রূপ আলো জ্বললে মায়ার অন্ধকার তখুনি হৃদয় থেকে দূর হবে একটুও দেরী হবে না। গোবিন্দ বিষয়ে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভ করবে তখনই তার ধীরতা লাভ হবে। এটি শ্রবণ কীর্ত্তন করতে করতেই হবে। ভগবানের রূপে দর্শনে যার নয়ন পরিতৃপ্ত হয়েছে ভগবানের কথা শ্রবণে যার শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করেছে, ভগবানের অধরামৃতে যার রাসনার চিরতরে তৃপ্তি হয়েছে ভগবানের অঙ্গগন্ধে যার নাসিকার পরিতৃপ্তি হয়েছে ভগবানের পাদপদ্মস্পর্শে যার ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করেছে সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে ধীর। অর্থাৎ যার কোনও ইন্দ্রিয়ই ভগবানের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোথাও তৃপ্তিলাভ করে না তাকেই ধীর বলা হবে। এই ধীর ব্যক্তি ভগবানের লীলা আস্বাদনের একমাত্র অধিকারী গোবিন্দই একমাত্র প্রভু। তিনিই ইন্দ্রিয়ের স্থৈর্য্যকারী তাতেই ইন্দ্রিয় স্থিতি লাভ করে। জীবের যে বিষয়ের প্রতি লালসা সে লালসা ইন্দ্রিরের নয় এ হল জীবাত্মগত বাসনার লালসা। ভগবানই একমাত্র নিজের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ দিয়ে ইন্দ্রিয়কে চিরতরে তৃপ্ত করতে পারেন।

শ্রীশুকদেব লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিলেন অনুশৃণুয়াৎ—অর্থাৎ পশ্চাতে থেকে শ্রবণ কীর্ত্তন করতে হবে এবং এই শ্রবণে কীর্ত্তনে বিরাম দেওয়া চলিবে না—নিরন্তর শুনতে হবে। কৃষ্ণানন্দ মহামহোৎসবে এই ভাগবত রস আস্বাদনের অধিকারী নির্বাচন করলেন বেদব্যাস রসিক এবং ভাবুক জনকে। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ আস্বাদনের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছেন— রসিক ভাবুক জনের নামেই শিরোনামাপত্র। এই রসিক ও ভাবুক বলতে একমাত্র সাধু গুরু বৈষ্ণবকে বোঝায়। তাই শ্রীগুরুপাদ পদ্মের পিছনে বসেই শ্রবণ কীর্ত্তন করতে পারলে তবেই আস্বাদন হবে ভোগ হবে। এ ভোগ নিজের স্বাতন্ত্র্যে শ্রবণ কীর্ত্তন করলে হবে না। মহৎ মুখনির্গলিত হরিকথাই শ্রবণ করা উচিত। কারণ দুধ বলকারক এবং উপকারী কিন্তু সর্পোচ্ছিষ্ট দুধ বিষের মত ত্যাজ্য। সুতরাং শ্রীশুকমুখ নির্গলিত হরিকথামৃত পান করবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মহারীজ পরীক্ষিৎ শ্রদ্ধালু হয়ে শ্রীশুকবাক্য শুনতে বসেছিলেন। এই আমাদের ভিক্ষা করতে হবে। কোথায় এ শ্রদ্ধা পাওয়া যাবে? যার শ্রদ্ধা হয়েছে তার কাছে শ্রদ্ধা ভিক্ষা করতে হবে। ভগবানের রসবিলাসের কথা শুনতে শুনতে প্রাকৃত বুদ্ধি আসবেই। তাই শুকবাক্যে সাধারণের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত রসগ্রহণের

নিষেধ আছে। কৃষ্ণানন্দ মহামহোৎসবে রস আস্বাদনের অধিকারী একমাত্র রসিক এবং ভাবুক। রসিক বলতে যিনি যে কোন রসে ভগবানকে আস্বাদন করতে জানেন বা পারেন—আর ভাবুক বলতে বলা আছে রসবিশেষভাবনাচতুরা ভাবুকাঃ। অর্থাৎ রসবিশেষে মধুর রসে যাঁরা গোবিন্দকে নিরন্তর ভাবনা করেন—তাঁরা হলেন ভাবুক। এর ওপরেও একটু কথা আছে। রাধাগোবিন্দের মধুর রসের লীলায় চরম আস্বাদনের মিলনের যে অবস্থা তার নাম মাদনাখ্য মহাভাব যেখানে রাধারাণী কৃষ্ণকণ্ঠ আলিঙ্গন করে 'হা কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন বুকে রেখে হারাই হারাই মিলনের চরম দশায় বিরহের আর্ত্তি। ব্রজলীলায় এটি অবস্থা বিশেষ ছিল মাত্র। এ অবস্থার যে কোন মূর্তি হতে পারে তা কেউ জানত না। এখানে মিলনের স্বরূপে বিরহের আর্তি এরই নাম প্রেম বৈচিত্ত্য দশা। এই দশা অর্থাৎ অবস্থার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নদীয়া লীলায় শ্রীগৌর স্বরূপে প্রকাশ। মহাজন বললেন গৌরস্বরূপ সম্বন্ধে—

মধুর গৌরাঙ্গ দেহ মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন—এই প্রেমবৈচিত্ত্য দশা মূর্তি পরিগ্রহ করে যে গৌরস্বরূপে প্রকাশ এই গৌরস্বরূপকে যারা নিরন্তর ভাবনা করেন তাঁরা হলেন ভাবুক। এই রসিক এবং ভাবুক জন হলেন শ্রীগুরুমহারাজ। তাই শ্রীগুরু আনুগত্যে শ্রীরাধামাধবের লীলারসভোগ করতে হবে। রাজভোগ পাওয়ার অদিকারী ভৃত্যের তো থাকতে পারে না। কিন্তু প্রভু যদি কৃপা করে রাজভোগের অংশ ভৃত্যকে দেন তাহলে সে অনায়াসে পেতে পারে। রাধাকৃষ্ণের লীলারস জীবের পক্ষে দুষ্পাচ্য। কলিজীবের পাকস্থলী দুর্বল, সুতরাং সে এটি হজম করতে পারে না। কারণ জীব কামনায় জর্জরিত আর ভগবান লীলা হল কামগন্ধহীন। কারণ কৃষ্ণে কোন প্রাকৃত কামনা যায় না—তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ। কৃষ্ণলীলারস কলিজীবের পক্ষে দুর্লক্ষ্য— কলিজীব তা দেখতে পায় না। এ লীলারস একমাত্র গৌরের ভোগ্য! গৌরসুন্দর হলেন রাধাকৃষ্ণ মূরতি আর কৃষ্ণপরিকরই হলেন গৌর পরিকর। গৌর যেমন যুগল গৌরপরিকরও যুগল। কৃষ্ণের এক এক সখা আর রাধারাণীর এক এক সখী মিলিত হয়ে এক এক গৌর পরিকর হয়েছেন। বলা আছে—কৃষ্ণসেবা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ। কৃষ্ণমনোবৃত্তি সখারূপ ধারণ করেছে। এবং শ্রীমতীর মনোবৃত্তি সখীরূপ ধারণ করেছে। কৃষ্ণের যে অঙ্গ শ্রীমতীর যে অঙ্গের প্রতি লুব্ধ হয়েছে সেই সেই অঙ্গ সমুদ্ভুত সখা ও সখীর মিলনে গৌর পরিকরের জন্ম। কৃষ্ণলীলায় কিন্তু

সখা সখীর মিলন হয় না। কারণ তাদের মিলনেই প্রয়োজন হয় না। রাধাকৃষ্ণের মিলনের তাদের সুখ। সখা সখীর মিলনে যে গৌরপরিকরের জন্মের কথা বলা হল সেটি কেবল প্রকাশ উপলক্ষ্যে বলা তা না হলে এ পরিকর হলেন নিত্য। কারণ পরিকর নিত্য না হলে লীলার নিত্যতা থাকে না আর লীলার নিত্যতা না থাকলে লীলা উপাস্যা হবেন না, কিন্তু ভগবান যেমন উপাস্য তাঁর লীলাও তেমনি উপাস্যা। লীলা নিত্যা এবং উপাস্যা বলেই লীলা কথার শ্রবণ কীর্ত্তনের ফলশ্রুতি শাস্ত্র দিয়েছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর চারিরসের ভোগ কৃষ্ণচন্দ্রের তাঁর নিত্য পরিকরের দ্বারে। তার মধ্যে আবার মধুররসের ভোগ তাঁর ভোগের চরম অবস্থা। সেই ভোগদাতা হলেন রাধারাণী এবং ব্রজগোপীরা। যেমন দুধ পরিবেশন এবং সেই দুধের ঘনীভূত অবস্থা সন্দেশ পরিবেশন সম্পূর্ণ পৃথক্। তেমনি রসেরও পর পর অবস্থা আছে। তারমধ্যে চরম অবস্থা ব্রজরামাদের সঙ্গে গোবিন্দের বিহার।

শ্রীরাধামাধবের লীলা কলির গাঢ় অন্ধকারে দুর্লক্ষ্য। কলিজীবের বুদ্ধিরূপ চক্ষু সে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এ ঘোর কলিতিমির নাশ করতে একমাত্র গৌরচন্দ্রিমাই সক্ষম। রাধামাধবের লীলা গাইবার আগে এইজন্যই গৌরচন্দ্রিকা গাইবার বিধি আছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে গৌরচন্দ্র বা গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া লীলা গাইলে ক্ষতি কি? পদকর্ত্তাগণ গৌরচন্দ্র গেয়েছেন রাধাগোবিন্দের লীলারস আস্বাদন করতে গিয়ে সেই সেই লীলায় তদ্ভাবাঢ্য গৌরচন্দ্রকে বর্ণনা করেছেন। গৌরসুন্দর সেই সেই লীলারস ভোগ করেছেন। এ লীলা কথা তাঁরা গৌরকে শোনাচ্ছেন— অর্থাৎ গৌরকে ভোগ করাচ্ছেন। গৌর শুনে সুখী হবেন ভোগ করবেন এইটিই পদকর্ত্তাদের অভিপ্রায়। গৌরকীর্ত্তন করে তারপর তাঁরা রাধাগেবিন্দের লীলা কথা আরম্ভ করেছেন। পদকর্ত্তারা সকলেই প্রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ। তাই তাঁদের স্বতন্ত্র কৃষ্ণলালসা নেই। এ লীলাকথা কওয়া হল তাদের গৌরের সেবা করা। এ ছাড়া তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এই তাঁদের উপাসনা—তাঁদের স্বতন্ত্র কৃষ্ণ উপাসনা নেই। রাধাকৃষ্ণ লীলায় অনুরূপ মহাপ্রভুর ভাব অঙ্কিত করেন। তদ্‌ভাবের লীলা—বর্ণনা করেন। পদকর্তাদের রাধাকৃষ্ণলীলাগুণ গান হল গৌর উপাসনার ফুল চন্দন। এইভাবে তাঁরা গৌর সেবা করেন। এইটিই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাদের গৌর সেবার উপকরণ হল রাধামাধবের স্মরণ ধ্যান কীর্ত্তন। তাই গৌর সেবাই হলো শ্রেষ্ঠ সেবা। তাহলেই অন্য সব সেবা হয়ে যাবে। গৌর সেবক গৌর সেবায় নিজে মজে অপরকে মজান। গৌর হলেন প্রেমবন্যার অবতার। তাই অঘটন ঘটাতে

পারে। চিরকালের অনর্পিত প্রেমসমর্পণ লীলায় গৌর অবতীর্ণ। পদকর্তা গৌরপদ বন্দনা গাইছেন অর্থাৎ গৌর লীলারস ভোগ করছেন। এইটির নামই গৌরচন্দ্রিকা। গৌর ভোগ করছেন এবং আনুষঙ্গে মহাজনও সে লীলারসের আস্বাদন পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন কোন প্রিয়জনের অঙ্গে আতর মাখালে সে আতরের গন্ধ যেমন যে মাখাচ্ছে তার নাসিকাকে বাদ দেয় না তেমনি তত্ত্বাবাঢ্য গৌর সুন্দরের বর্ণনায় মহাজনগণও সে লীলারস ভোগে মত্ত হয়ে যান এবং এইভাবে রাধাগোবিন্দের লীলারসভোগে তাদের আর স্বাতন্ত্র্যদোষ থাকে না। রাধামাধবের এই মধুর রসের নিগূঢ় লীলার আস্বাদন হলো জীবের অলভ্য লাভ। একমাত্র শ্রীগুরুপাদ পদ্মের আনুগত্যে যদি তাঁর অধরামৃত গ্রহণ করতে পারা যায় তাহলে আর রসের দুষ্পাচ্যতা থাকে না। তাতে আমাদেরও অলভ্য লাভ হয়ে যায়। রাজার ভৃত্য যেমন রাজার দেওয়া মুক্তোমালা কণ্ঠে ধারণ করতে পারে—রাজার রাজভোগ যেমন রাজা দিলে ভিখারীও আস্বাদন করতে পারে তেমনি শ্রীগুরুদেব রসিক ভাবুক— তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলারস ভোগ করেন এবং শ্রীগুরুকৃপায় তাঁর আনুগত্যে আমরাও সেই রস আস্বাদন করে ধন্য হতে পারি।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ গৌরলীলার মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন জীবনে আমি কি লাভ করেছি তা বলতে পারি না—তবে এইটুকু ভাল করে বুঝেছি যে আমার কোন বিষয়ে প্রয়োজন নেই। বৃন্দাবন শতকগ্রন্থে গৌরের মহিমা বর্ণন করেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—

অপ্যগণ্যং মহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ।
অনুপাসিতচৈতন্যমধন্যং মন্যতে মতিঃ।।

কেউ যদি অগণিত মহা মহা পূণ্য করে এবং অনন্যচিত্তে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাখতি নেয় কিন্তু সে যদি আমার গৌরচরণ না ভজে তাহলে আমার মতে তার মতি অর্থাৎ বুদ্ধি ধন্য হল না।

আরও বলেছেন—যথা যথা গৌরপদাবিন্দে

বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশি
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ
রাধাপদাম্ভোজ সুধাম্বুরাশিঃ ।।

গৌরপাদপদ্মে যেমন যেমন ভক্তি লাভ হবে তেমনি তেমনি রাধাগোন্দিরের লীলা হৃদয়ে স্ফুর্তি পাবে। গোপী আনুগত্যে যে কৃষ্ণভজন সেইটিই সর্বোৎকৃষ্ট।

শ্রীগৌরসুন্দর এই গোপীপ্রেম নিজে আস্বাদন করে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন কেমন করে কৃষ্ণভজন করতে হয়। পরম কৃপালু পতিতপাবন অবতার শ্রীগৌরসুন্দরের দান হলেন বন্যার দান। এ দানের মাপকাঠি নেই। এ দান অতি যত্নে সঞ্চিত ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি ভাসিয়ে দিয়ে প্রেমরত্নের সিন্দুক ঘরে পৌঁছে দিতে পারে।

গৌরকৃপার মাধুরী যখন হৃদয়কে প্লাবিত করে তখনই রাধাগোবিন্দের লীলারসের স্ফূর্তি হৃদয়ে হয়! নতুবা হয় না। বহুযুগের কারাবাসীর কিছুতেই মুক্তির সম্ভাবনা নেই কিন্তু সম্রাটের শুভাগমনে যেমন তার মুক্তি সম্ভব হয়। তেমনি অনাদিকালের অজ্ঞানতম সাচ্ছান্ন কলিজীবেরও রাধাগোবিন্দের লীলারস গ্রহণের সামর্থ্য ছিল না কিন্তু সম্রাটের সম্রাট শ্রীগৌরসুন্দরের দানে শ্রীগোপীজনবল্লভের ভজন পথ সুগম হল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আদেশে ছয় গোস্বামী প্রকাশ করলেন শ্রীবৃন্দাবন ধামে। কৃষ্ণলীলায় সখীরা দূরে কুঞ্জের বাইরে আর কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশের অধিকার একমাত্র মঞ্জরীগণের। এই মঞ্জরীদের বয়স পাঁচ অথবা ছয় বৎসর । তাঁরা নিভৃত কুঞ্জে থাকতেন সেবা পরায়ণা হয়ে। মুখে তাদের কথা ছিল না তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন। গৌরলীলায় এই মঞ্জরীরাই হলেন ছয় গোস্বামী, গৌর তাদের মুখে বোল ফোটালেন। মূকং করোতি বাচালম্—মুককে বাচাল করলেন গৌরসুন্দর। কাছে থাকলে কথা বলবার সুবিধা হবে না তাই তাদের পাঠালেন সুদূর বৃন্দাবনধামে। আজ্ঞা বলবতী। তাই ছয় গোস্বামী গৌর আদেশ শিরোধার্য করে বৃন্দাবনে এসে রাধামাধবের রসময়ী লীলা কথা প্রকাশ করলেন গ্রন্থের মাধ্যমে। আর ব্রজের ললিতা বিশাখা সখী যাঁরা ব্রজলীলায় কাছে থাকতে পারেন নি তাঁদের এবারে স্বরূপ দামোদরজী ও রায় রামানন্দরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাছে রেখে তাদের মনের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করলেন।

নিতাই গৌরের করুণাই কথা বলায় বা শোনায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণেই রাধামাধবের লীলা স্মরণ ও ভোগ সম্ভব। শ্রীগুরুদত্ত নাম মন্ত্র বলে গোপীজন বল্লভের ভজন সুলভ হয়ে ওঠে। এই ভজনে শ্যামে কাম এনে দেবে। তাহলেই প্রাকৃত কামনা চলে যাবে। কৃষ্ণভক্তিমদিরা পানে মত্ত হলে হৃদয় কটি হতে প্রাকৃতবাসনাবসন কখন খসে পড়বে বুঝাই যাবে না।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ এবং বৈষ্ণব এই তিন জনের পদরজঃ বিঘ্ন বিনাশ করে। বিঘ্ন বিনাশ হলে বাঞ্ছিত পূরণ হতে আর দেরী থাকে না। বাজার থেকে আনা

জিনিষ যেমন গঙ্গাজলে ধুয়ে পবিত্র করে ঠাকুরের ভোগের জন্য উৎসর্গ করতে হয় তেমনি আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলিও বাজারের আনা জিনিষের মত অপবিত্র। তাই সেগুলিকে শ্রীগুরুস্মরণে পবিত্র করে ধুয়ে নিয়ে তবে ঝুলন মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। চিত্ত এবং বাক্য শুদ্ধ করবার জন্য মাধবের নাম স্মরণ করা হয়।

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্যেষু মাধবম্॥

এই স্মরণই জানিয়ে দিল যে সংকীর্তনই চিত্তশুদ্ধির পরম উপায়। কলিযুগের জীবের চিত্ত এতই বিকল যে তারা মাধবকে স্মরণ করতেও পারে না। পূর্ণ শশধর শ্রীচৈতন্য গোঁসাই মাধবকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা ভাণ্ডার শ্রীমন্নিত্যানন্দদ্বারে কলিজীবের কাছে বিতরিত হয়েছে এই গৌরকরুণা ভিক্ষার জন্য নিতাই-এর করুণার দ্বারস্থ হতে হবে। কারণ নিতাই যে গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী। ভাণ্ডারী যাকে দেবে সেই তো পাবে। গৌর করুণা পেলে আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না। কারণ রসের আস্বাদন করতে করতে তার পরিণতি হল শ্রীগৌরসুন্দর। তাই রসের উৎকর্ষের আস্বাদন গৌর স্বরূপ ভিন্ন হয় না। কলিযুগের কৃপাকারী চৈতন্য গোঁসাই। গৌরজলদের কৃপাবারি সকলের ওপরেই কার্যকরী হবে। যেমন বৃষ্টির জলে শস্যের ক্ষেত, সব্জীর ক্ষেত, ফুলের বাগান সকলেরই উপকার হয় তেমনি গৌরভজন করলে যে যে মার্গেরই হোক না কেন তার নিজ নিজ অভীষ্ট পূরণের সুযোগ পাবে, গৌর করুণা পর্জন্যবল্লক্ষণ প্রবৃত্তির মতো কাজ করে। তাই আমার গুরুমহারাজ শ্রীল বাবাজীমহারাজ এত আদর করে বললেন গোরা আমার আগা গোরা আমার গোড়া— গোরা আমার আগাগোড়া। প্রথমে গৌর আবার মহারাসবিলাসের পরিণতির শেষেও গোরা। রাধাকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গ মালা গৌরেরই স্বরূপ। তাই গ্রন্থারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা রাধামাধবের লীলারসপুষ্টির সহায়ক। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ তাই বলেছেন—

কৃষ্ণলীলামৃতসার তার বহে শতশত ধার
দশদিক্ বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মন হংস চরাও তাহাতে ॥

পঞ্চবিষয় সরোবরে তো মনোহংস অনেক চরান হয়েছে এখন শ্রীগুরুস্মরণ করে শ্রীগৌরকৃপার ভিখারী হয়ে শ্রীরাধামাধবের লীলারস আস্বাদন করতে পারলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর অধরামৃতদানে আমাদের তৃপ্ত করবেন—আমরাও সে প্রসাদ পেয়ে ধন্য হব।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী গ্রন্থে মহাজন নরহরিদাস, উদ্ধবদাস, শিবরামদাস প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্যদবৃন্দ গৌরচন্দ্রের ঝুলনলীলা বর্ণনা করেছেন। পূর্ব্বলীলা অর্থাৎ ব্রজলীলা স্মরণ করে শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরসুন্দর গদাধর সঙ্গে ঝুলনলীলা আস্বাদন করছেন।

ভক্তসুখীজনের আস্বাদনের জন্য গৌরচন্দ্রিকার কয়েকটি পদ এইসঙ্গে যোজনা করা হল।

ঝুলন যাত্রা কীর্ত্তন

গৌরচন্দ্র

(১)

জয়জয়ন্তী

দেখত ঝুলত, গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি রূপনিরুপম কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলাওত কত ভকতবৃন্দ গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন জয় জয় রব উথলে নগর নদীয়া॥
নয়ন কমল মুখ নিরমল শারদ চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক ধায় একমুখ হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া॥
ধন্য কলিযুগ গোরা অবতার সুরধুনী ধনি ধনিয়া!
গোরাচাঁদ বিনে আন নাহি মনে বাসুঘোষ কহে জানিয়া॥

(২)

ইমন বা কামোদ

দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর!
সুরধুনীতীরে গদাধরসঙ্গহি চাঁদনি রজনী উজোর॥
শাঙন মাহ, গগনে ঘনগরজন লসতহি দামিনী মাল।
বরিখত বারি পবন মৃদুমন্দহি, গরজ তরঙ্গ বিশাল॥
বিবিধ সুরঙ্গ, রচতহি দোলা খচিত কুসুমচয় দাম।
বটতরুডালে ডোর করি বন্ধন মালতীগুচ্ছ সুঠান॥
বৈঠল গৌর বামে প্রিয় গদাধর ঝুলন রঙ্গ রসে ভাস।
সহচর মেলি দোলায়ত মৃদু মৃদু দোলা ধরিয়া দ্বৌপাশ॥
বাজত মৃদঙ্গ পূরবরস গায়ত সংকীর্ত্তন সুররঙ্গ।
শ্রীনিত্যানন্দ শান্তিপুরনায়ক হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ॥
পুরুষোত্তম সঞ্জয় আদি বরখত কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধবদাস নয়নে কব হেরব গৌর হোয়ব অনুকূল॥

(৩)

কামোদ দশকুশি

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী।
ঝুলত যুগল কিশোরক যৈছন চলত সোই করি ভঙ্গি॥
রচত শিঙ্গার, ঝুলন সুখ হোয়ব, মনহি ভেল উপনীত।
যৈছন সহচর গাওত আনন্দে গৌর পহুঁ মনোনীত॥
হেরি গদাধর, লহুলহু বোলত মনমাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুয়া সনে ঝুলন বিলসব সহচরগণ করি রঙ্গ॥
ঐছে বিলাস গোরা পহুঁ বিলসয়ে, পূরব প্রেমরসে ভোর।
কহ শিবরাম মনহি সুখ ঐছন, কোই করব অব ওর॥

(৪)

মল্লার বা ইমন

ঝুলত রসময় গৌরকিশোর।
সুরধুনীতীরে তুঙ্গতরু তলহি বিরচিত নিরুপম ললিত হিন্ডোর॥
পরিকর সুঘন ঝুলায়ত লঘু লঘু গায়ত সরসতালরসমাতি।
উচরত রুচির বচন ধিক ধিক ধিনি বায়ত মধুর যন্ত্র কত ভাতি॥
নদীয়াপুর নরনারীনিকর ঘর, তেজি চলত ধৃতি ধরই না পারি।
লোচন চপল, নিমিখ নাহি সঞ্চরু হাসমিলিত বিধুবদন নেহারি॥
সুরগণ গগনে মগন গণ সহ বরষত কুসুম করত জয় কারি॥
নরহরি প্রাণনাথ গুণে উনমত ভণত নিয়ত গুণ গণই না পারি॥

(৫)

কামোদ

গোরা পহুঁ দোলে হিণ্ডোলেতে। কত সুখ সে ভাব ভাবিতে।
গদাধর মুখ পানে চায়। পুলক ভরয়ে হেমগায়॥
পারিষদ উলসিত চিতে। নামাইয়া হিণ্ডোলা হইতে।
বসাইতে নীপতরুমূলে নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে
অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার বাঢ়ে মহাসুখের পাথার॥

শ্রীবাসাদি যতন করিয়া দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া।
সভার পরাণ গোরারায় ভুঞ্জিব কি সভারে ভুঞ্জায়।
যে কৌতুক কহিতে কি পারি অবশেষে ভুঞ্জে নরহরি॥

(৬)

মল্লার

নবঘন কানন শোভন কুঞ্জ বিকশিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ।
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল। তা'পর বৈঠলি কিশোরী কিশোর॥
ব্রজরমণীগণ দেওত ঝকোর গিরত জানি ধনি করতহিঁ কোর॥
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ॥

(৭)

মল্লার

দেখ সখি ঝুলত যুগলকিশোর নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন জোর॥
ললিতা বিশাখা সখী ঝুলাওত সুখে আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে॥
গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর রঙ্গিনী সঙ্গিনী ঘেরত চৌওর॥
বিবিধ কুসুমে সবে রচিত হিন্দোলা। দোলায় যুগল সখি আনন্দে বিভোলা॥
ঝুলাওত সখীগণ করতালি দিয়া সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বঁধুয়া
বিগলিত দুকূল উদিত স্বেদ বিন্দু অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ ইন্দু॥
হেরি সব সখীগণ দোঁহা,কার শ্রম। চামর বীজন লেই করয়ে সেবন॥
ভ্রমকর কোকিল সব বসি তরু ডালে। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে।
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে। সখীসহ দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে॥

(৮)

মল্লার

দেখ সখি ঝুলত রাধাশ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র সুমেলি সুস্বর তান মান সুঠাম॥

আষাঢ় গত পুন মাহ শাওন, সুখদ যমুনা তীর।
চাঁদনী রজনী সুখময় সুখোদয় মন্দ মন্দ মলয় সমীর॥
পরিপূর্ণ সরোবর প্রফুল্লিত তরুবর গগনহিঁ গরজে গভীর!
ঘোর ঘটা ঘন দামিনী দমকত বিন্দু বরিখত নীর॥
তঁহি কল্পদ্রুম তল ছায়া সুশীতল, রচিত রতন হিণ্ডোর।
ঝুলয়ে তছুপর গোরী শ্যামর, ঝুলায়ে সখী দুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু দোলয়ে দুহুঁ, তনু, অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেমনীল, কমল বিকশিত, স্বেদবিন্দু পরকাশ॥
ছরম হেরি কোই, বীজন বীজই, কর্পূর তাম্বুল যোগায়।
সুরট মেঘ মল্লার গাওত, মোহন মৃদঙ্গ বাজায়॥
কুসুমচয় বর, হার লটকত, ভ্রমর গুণ গুণ বোল।
হংস সারস সুস্বর শবদিত, দাদুরী, ঘন ঘন রোল॥
দুঁহুভালে চন্দন, চাঁদ চমকিত, তিলক রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট, সুচারু চন্দ্রিক, পীঠ পরি বেণী দোল॥
দুঁহু শ্রবণে কুণ্ডল, চপল ঝলমল, হৃদয়ে শশীমণি হার।
ঝলকে আভরণ ঝঙ্কৃত ঝন ঝন ঝুকিত ঝুলন বিহার॥
কোই মসৃণ ঘুসৃণ, সুগন্ধি ছিরকত, শ্যামগোরী অঙ্গ হেরি।
সখী ভাবে ইঙ্গিতহিঁ, দাস উদ্ধব, করত কুসুমকি ঢেরি॥

(৯)

কল্যাণী

ঝুলত শ্যাম গোরী বাম আনন্দ রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত রভস কেলি, ঝুলাওত সব সখিনী মেলি গাওত কত ভাতিয়া॥
হেমমণিযুত বরহিঁ ডোর রচিত কুসুম গন্ধে ভোর, পড়ত ভ্রমর পাঁতিয়া।
নবীনলতায় জড়িত ডাল বৃন্দাবিপিন শোভিত ভাল চাঁদ উজোর রাতিয়াঁ॥
নবঘন তনু দোলয়ে শ্যাম, রাই সঙ্গে ঝুলত বাম, তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার ঝুলিত দুলিত গলে দোঁহার হিলন দুঁহুক গাতিয়া।
ধি ধি কট ধিয়া তাথৈয়া বোল, বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল তিনিনা তিনিনা ভাঁতিয়া

ভেদ পবন গ্রামপূর, ঘোর মরদ জীল সুর, বরণ নাহিক জাতিয়া
মণি আভরণ কিঙ্কিনী বঙ্ক ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক ঝন ঝন ঝন ঝাঁতিয়া
রাধা মোহন চরণে আশ, কেবল ভরসা উদ্ধব দাস রচিত পূরিত ছাতিয়া॥

(১০)

আজু রাধা শ্যাম সঙ্গেতে ঝুলে।
মণিময় নব, হিন্দোলা সাজাইয়া, বংশীবটতট কালিন্দীকূলে॥
ললিতাদি রঙ্গে ভঙ্গী করি বেগে ঝুলায়ই দুঁহু বদন চাহিয়া।
রসবতী ভুজ, পসারি নাগরে ধরে ভয়ে অতি আকুল হৈয়া॥
শ্যাম অঙ্গে চারু, চিবুক পরশি, চুম্ব দেই ঘন মনের সুখে।
তাহা দেখি সখী, হাসি রসে ভাসি, বসন অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে।
কৌতুক বচন, কহি বৃন্দাদেবী, ঝুলায়ই পুনঃ যতনে ধীরে।
কি আনন্দ বৃন্দা-বনে নরহরি জয় জয় দিয়া রঙ্গেতে ফিরে॥

(১১)

ধানশী

ঝুলনা হইতে নামিলা তুরিতে রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে বসিলা যতনে, রতন মন্দির মাঝ॥
সুচামর লই বীজন বীজই, সেবাপরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে বদন পাখালে, বসনে মোছাঞা দেখি॥
থারি ভরি কোই বিবিধ মিঠাই, ধরি দুঁহু সম্মুখে।
সখীগণ সঞে, কতহুঁ কৌতুকে ভোজন করিল সুখে॥
তাম্বুল সাজাঞা, কোন সখী লঞা, দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ কুসুমে, আপাদ বদনে নিছিয়া নিছিয়া নিল॥
কুসুম তলপে অলপে অলপে বসিলা রাধিকা শ্যাম।
অলসে ঈষত, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম॥
দেখি সখীগণে কতই যতনে শুতায়ল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দাস বৈষ্ণব ধায়॥

———

বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু

বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু রাধামাধবের হিন্দোলা লীলা বা ঝুলন লীলা, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ তাঁর শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে রাধামাধবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ করে বর্ণনা করেছেন এবং জগতে ভক্তবৈষ্ণব সমাজকে এক অনবদ্য দান দিয়েছেন। গ্রন্থের নামকরণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভাবনাই একমাত্র অমৃত আর যা কিছু ভাবনা তার কোনও দাম নেই। ভাবতে হয় তো কৃষ্ণ ভাবি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই ভজন পন্থায় বলেছেন—

আন কথা না বলিব আন কথা না শুনিব

সকলই করিব পরমার্থ

আন কথা বলতে ভগবানের কথা এবং ভক্তের কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা। এই গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থের একাদশ সর্গে যে হিন্দোলা লীলা বর্ণিত হয়েছে তা মূল এবং তার সঙ্গে প্রতি শ্লোকের টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে গ্রন্থ কুড়িটি সর্গে এক মহাকাব্য । হিন্দোলা লীলা হলেন মধ্যাহ্ন লীলা এবং প্রতিদিনের লীলা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ ঝুলন লীলার আগে একটি অভিনব লীলা আস্বাদন করে জগৎকে দান করেছেন। বঞ্জুল (বকুল) মঞ্জুলকুঞ্জে বৃন্দাবনদেবীর নির্দেশে বৃন্দাবনের তরুলতা আজ অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়েছেন। ছয়ঋতু যুগপৎ সেবার জন্য উন্মুখ। আমাদের এ জগতের ধারা হল ঋতুর ক্রমিকতা একটি ঋতুর পরে আর একটি ঋতু আসে। কিন্তু বৃন্দাবন হলেন অপ্রাকৃত ভূমি চিন্ময়ী ভূমি কাজেই প্রকৃত নিয়মের বাইরে। বৃন্দাবনে ছয়ঋতু একই সময়ে প্রকাশিত এবং সকলেই রাধামাধবের সেবা করার জন্য উন্মুখ। জলবিহারের জন্য গ্রীষ্ম ঋতু গেলেন জলের মধ্যে বনভূমিতে শরতের শোভা। অবশ্য সর্বোপরি বসন্তঋতুর প্রভাব সর্বত্র। সকল ঋতু ওক জায়গায় এসে মিলেছেন—ঋতুর সৌন্দর্য্য সমস্ত বনভূমিকে সুশোভিত করেছে। শরৎলক্ষ্মী রয়েছেন গিরিগোর্দ্ধনে। একসঙ্গে সব ঋতৃ প্রকাশ পেয়েছে বলে রাসলীলার কালে হেমন্তও দেখা গেছে শীতের কুসুম কুন্দস্রক-কুন্দফুলের মালা। কারণ এ হল অপ্রাকৃত জগতের কথা। এখানে সকলের একটাই উদ্দেশ্য রাধামাধবকে সুখী করা! এছাড় তাদের নিজেদের আর কোন অভিপ্রায় নেই।

তাদের আলাদা করে নিজেদের কোন সাধন সিদ্ধি বা ধর্ম নেই—তাদের ধ্যান জ্ঞান হল শুধু রাধামাধবকে সুখী করা। সেবা অর্থে সুখ দেওয়াই বুঝায়। রাধাগোবিন্দকে সুখী করেই তাদের সুখ। তাদের নিজেদের সুখ তারা আলাদা করে বুঝে না। তারা সেবা বই আর জানে না। অনঙ্গসুখদ কুঞ্জে রাধামাধব ঝুলনলীলার আগে এক পূর্বলীলার প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ তো রসিকশেখর রসরাজ রসিকেন্দ্র চূড়ামনি—তাই রস সৃষ্টি র জন্য তিনি এক কৌতুক করেছেন। কুঞ্জের ভিতরে রাধামাধব আপন বিলাসে রত। এখানে সখীদের থাকার অধিকার নেই। তারা কুঞ্জের বাইরে থাকেন। নিভৃত কুঞ্জে তখন থাকেন সেবাপরায়ণ্য মঞ্জরীর দল। তারা কিঙ্করীর দল মন বুঝে তারা সেবা করতে জানে। তাদের বয়স এই পাঁচ বা ছয় বছর! এরা হল রাধারাণীর কায়ব্যূহ। রাধারাণীর রতিমঞ্জরী রাধারণীর রূপ রূপমঞ্জরী, রাধারাণীর গুণ গুণমঞ্জরী, রাধারাণীর বিলাস বিলাসমঞ্জরী। এরা সকলেই রাধারাণীর স্বরূপ—এরা কথা বলে না শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে এদের কাছে রাধামাধবের কোন লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই। নিজের হাত পাকে যেমন কেউ লজ্জা কেউ করে না এও সেই রকম।

রতিবিলাস অন্তে কুঞ্জ থেকে রাধাগোবিন্দ বাইরে আসছেন না। সখীরা তো বাইরে অপেক্ষা করছেন-দেরী দেখে তারা ব্যস্ত হয়েছেন কারণ বেলা বেড়ে যাচ্ছে বর্ষাহর্ষ বনে যাবেন ঝুলনলীলায়। যত বেলা বাড়বে পথে তত তাপ বাড়বে। এদিকে মদনমোহন অপরূপ মদনে মেতেছেন। কৃষ্ণ আজ মৃগমদ কৃষ্ণ অগুরু মিশ্রণ করে রাধারাণীর সারা অঙ্গে, লেপন করেছেন রাধারাণীকে কৃষ্ণ সাজাবেন। কারণ কৃষ্ণ তো অখিলকলারসের গুরু। চৌষট্টি প্রকার কলা বিদ্যা সব তাঁর জানা আছে। রাধারাণীকে পীতাম্বর পরিয়েছেন—মাথায় দিয়েছেন মোহনচূড়া ময়ূরপাখা—কণ্ঠে দিয়েছেন বনমালা। রাধারাণীর হাতে দিয়েছেন একটি জপমালা আসনে বসে রাধারাণী মালা জপ করছেন। কুঞ্জে আজ যেন দুইই কৃষ্ণ কলাকুশলী কৃষ্ণ আজ রাধারাণীকে এমন করেই কৃষ্ণ রূপে সাজিয়েছেন যে দেখে একটুও বুঝা যাচ্ছে না কোন জন আসল কৃষ্ণ আর কোনজন রাধারাণী। এদিকে দেরি দেখে ব্যস্ত হয়ে সখীরা কুঞ্জের ভিতরে ঢুকে পড়েছেন—কুঞ্জে দেখেন ওমা এ কি কাণ্ড আজ কুঞ্জে দুই কৃষ্ণ কি করে হল? বুঝতেই পারছেন না কোনজন আসল কৃষ্ণ। রাধারাণী

তো আসনে বসে মালা জপ করছেন। তখন সখীরা ভাবছেন—আমাদের রাধারাণী তো জপ করবে না—কৃষ্ণই তো রাধারাণীর নাম জপ করেন। তাই আসল কৃষ্ণকে রাধারাণী মনে করে কুঞ্জের বাইরে নিয়ে এসে তার গায়ে প্রতি অঙ্গে হাত দিয়ে দিয়ে সখীরা প্রশ্ন করছেন—হ্যাঁ সখি, তোর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুরুষের মত হয়ে গেল কি করে? তোর কেশ আলুলায়িত অঙ্গ শিথিল, নিধিবন্ধ মুক্ত, অধররাগ বিলুপ্ত হয়েছে। দেখে আমাদের মনে হচ্ছে তোর মাধবের স্পর্শ হয়েছে। পরমপুরুষ মাধবের স্পর্শেই তো একমাত্র বন্ধন মুক্তি হতে পারে। রাগ আসক্তি অর্থাৎ শিথিল হতে পারে কৃষ্ণস্পর্শে তোমার সারা দেহ কম্পিত হচ্ছে। কৃষ্ণভক্তিঅঙ্গযাজনে যদি দেহ কম্পিত হয় তাহলে কৃষ্ণস্পর্শে যে কম্পন হবে এ আর বেশি কথা কি? কৃষ্ণমাধুর্য্য তরঙ্গ আজ রাধারাণী স্বর্ণকমলিনীকে স্পর্শ করেছে তাই কম্পন। সবই তো বুঝলাম তবে তোর যে পুরুষের মত হয়ে গেছে কি করে এটি তো বুঝে উঠতে পারছি না। তখন কৃষ্ণ রাধারাণীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে সখীদের কাছে বললেন সখী, সেই ধূর্ত্ত কি করেছে জানিস্? সে যখন মন্ত্রপূত জল নিয়ে আমার সারা অঙ্গে ছিটিয়ে দিল তখন আমার সব অঙ্গ পুরুষের মত হয়ে গেল তখন সখীরা জিজ্ঞাসা করছেন সখি, তা না হয় হল কিন্তু তোর কণ্ঠস্বর তো বদলায় নি সেটি তো তোর ঠিক আছে। তখন কৃষ্ণ বলছেন—যখন সেই ধূর্ত্ত সারা দেহে জল ছিটিয়ে দেয় তখন আমি মুখ বন্ধ করে ছিলাম তাই জল ভিতরে যেতে পারে নি সেইজন্য কণ্ঠস্বর বদলায় নি। রাধারাণীর স্বরূপে কৃষ্ণ বলছেন—সেই ধূর্ত্তর এ লাঞ্ছনায় কথা তো সকলের সামনে প্রকাশ করা যায় না—তবে তোরা আমার অন্তরঙ্গা সখী তাই তোদের যদি একজনকে নিভৃতে পেতাম তাহলে মনের কথা বলতে পারতাম। তখন ললিতা বিশাখা প্রত্যেকেরই তো সে কথা শুনবার জন্য অত্যন্ত কৌতুহল। সকলেই বলেছেন—সখি আমাকে আগে বল— আমাকে আগে বল। তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে ললিতাকে এক নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে তার কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন তখন ললিতা তো লজ্জায় মরে যাচ্ছেন কারও কাছে সেটি প্রকাশ করতে পারছেন না। এইরকম করে বিশাখা চিত্রা চম্পকলতা সকলের কাছে এক এক করে নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলেন।

এরপরে কুঞ্জ হতে রাধারাণী এবং গোবিন্দকে নিয়ে সখীরা সকলে মিলে

শ্রীশ্রীহিন্দোলালীলা আস্বাদনের জন্য অনঙ্গ সুখদ কুঞ্জ থেকে যাত্রা করলেন যাবেন বর্ষাহর্ষবনে— সেখানে রাধামাধবের ঝুলননোৎসব।

শ্যামসুন্দরের শিল্প চাতুর্য্য চমৎকার। বৃন্দাবনে সেবার জন্য বৈকুণ্ঠের সেব্যা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী স্বয়ং নিযুক্তা হয়ে আছেন। তাই বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্য বেশী। তুলসী দাসজী বলেছেন—ওজনে যেটি ভারী হয় সেটি নীচে নামে আর যেটি হাল্কা হয় সেটি ওপরে ওঠে। তাই বৈকুণ্ঠ হাল্কা বলে ওপরে আর বৃন্দাবন ভারী বলে নীচে।

এর পরে বর্ষাহর্ষ বনে শ্রীশ্রীহিন্দোলালীলা।

হিন্দোলা লীলা

(শ্লোক অনুযায়ী ব্যাখ্যা)

শ্রীরাধামাধব এইরকম কৌতুক করে রসে পরিপূর্ণ হয়ে কুঞ্জের বাইরে এসে দাঁড়ালেন । সখীসমাজ তো তাঁদের ঘিরে আছেন। কারণ তাঁরা এতক্ষণ কুঞ্জের বাইরেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন। শ্রীযুগল কুঞ্জের বাইরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁদের উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বাড়ছিল। এতক্ষণে তাঁদের উৎকণ্ঠা একটু কমল এইবারে তাঁরা যাত্রা করবেন। শ্রীমতী রাধারাণীর অপাঙ্গ দৃষ্টি শ্রীশ্যামসুন্দরের উপর পড়ল। তাঁর নয়ন ভ্রমর গোবিন্দের বদন কমলের মধুপানে মেতে উঠল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই অসমসুষমা আস্বাদনের জন্য কোটি কোটি মদন যেন মদন মোহনের চরণের কান্তির কণাকে অর্চনা করতে লাগল সে সৌন্দর্য্যের যদি কণার আস্বাদন সে করতে পারে তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করবে। জীবনকে সফল মনে করবে। শ্রীবিদগ্ধবর নাগরেন্দ্র চূড়ামণি রসিকশেখর হঠাৎ নিজ বাম হাতখানি শ্রীরাধারাণীর কাঁধে রাখলেন। সে অমৃতস্পর্শে শ্রীরাধারাণীর দেহলতা দুলে দুলে উঠল আর ভাব ভরে তনু কম্পিত হতে লাগল—রাধারাণীর সর্বাঙ্গে আনন্দ পুলকের ঘনঘটা। দেখে মনে হচ্ছে অনন্ত অনিন্দ মাধুর্য্যের অসম সুষমা সাগরের তরঙ্গস্পর্শে যেন রাই প্রফুল্লিত কমলিনী পুনঃ পুনঃ মৃদু মৃদু কম্পিত হচ্ছেন।

বিশ্বের ধ্যানের মূর্ত্তি শ্রীরাধামাধব আজ পথে বেড়িয়েছেন। তাদের দুইপাশে আছেন সেবাপরায়ণা সখী। সেবা বলতে সুখ দেওয়া বুঝায়। তারা সুখ দিতে ভাল জানে। সেবার জন্যই তারা ঘরকে বন করেছে আর বনকে করেছে ঘর। আপনাকে করেছে পর আর পরকে করেছে আপন। আগে থেকেই তারা প্রস্তুত হয়েছে। সুসজ্জিত সুবাসিত তাম্বুল বীটিকা অর্থাৎ পানের খিলি নিয়ে এসেছে। রাধারাণীর বামদিকে দণ্ডায়মানা সখী পানের খিলি রাধারাণীর বামহস্তে দিচ্ছে রাধারাণী সেটি বাঁ হাতের অঙ্গুলি দিয়ে নিয়ে শ্যামসুন্দরের বদন কমলে দিচ্ছেন। আবার শ্যাম সুন্দরের ডান দিকে দণ্ডায়মানা সখী শ্যামসুন্দরের ডানহাতে পানের খিলি দিচ্ছে শ্রীগোবিন্দ সে পানের খিলি ডানহাতে নিয়ে রাধারাণীর বদন কমলে দিচ্ছেন। এতে সেবার পরিপাটি বুঝা যাচ্ছে সেব্য সেব্যা কো সুখী হচ্ছেনই সেবাপরায়ণা সখীদের সুখের অন্ত নেই। এর পরে শ্রীগোবিন্দের মনের মধ্যে একটু কৌতুক করবার

ইচ্ছা জাগল। রসরাজ রসের পরিপাটি জানেন। তাই রস বিশেষভাবে আস্বাদন করবার জন্য নিজের বাম হাতখানি যে রাধার কাঁধে রেখেছিলেন সেই হাত দিয়ে রাধারাণী পীন পয়োধর বক্ষোজ কমল স্পর্শ করতে উদ্যত হলেন। তখন বামা নায়িকা শ্রীমতী রাধারাণী তাকে বাহু দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। শ্রীযুগলের এই ব্যবহারে যাঁরা লীলারসামোদী রসিক তাঁরা আস্বাদন করছেন শ্রীগুরুকৃপায় তাঁদের এই ব্যবহার অতি অদ্ভুত এবং বিচিত্র অনন্ত মাধুরীতে ভরা। দেখে মনে হচ্ছে শ্যামসুন্দরের অসীম লাবণ্যভরা বাহুর যে করপদ্ম তা যেন শ্রীরাধারাণীর বক্ষোজরূপ চক্রবাককে আচ্ছাদন করতে যাচ্ছে আর শ্রীরাধার কর যেন রক্তোৎপল সেটি তাকে বাধা দিচ্ছে। এ ব্যবহারে কয়েকটি বিরুদ্ধ ভাব ফুটেছে। প্রথমতঃ পদ্ম (শ্যামসুন্দরের করপদ্ম) সে তো জড় জড়স্বভাব পদ্ম তো অচেতন জড়। জড়বস্তুর তো কোন আস্বাদনের চেষ্ঠা জাগতেই পারে না। সে বক্ষোজ চক্রবাককে আচ্ছাদন করতে যাচ্ছে— অর্থাৎ আস্বাদনের চেষ্টা এটি অদ্ভুত। তার উপর পদ্ম এবং চক্রবাক—দুই জনের মিত্র হল সূর্য। কারণ সূর্যের কিরণ স্পর্শে পদ্ম ফোটে তাই সূর্যকে বলা হয় পদ্মবন্ধু। আর চক্রবাক এবং চক্তবাকীর মিলন হয় দিনের বেলায়। সন্ধ্যার পর অর্থাৎ সূর্যাস্তে তাদের বিরহ। নদীর এক পাড়ে থাকে চক্রবাক অপর পাড়ে থাকে চক্রবাকী সারা রাত তারা উভয়ের বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করে। দিনের বেলায় মিলন হয় বলে সূর্য তাদের বন্ধু। এইটিই স্বাভাবিক। পদ্ম এবং চক্রবাক দুইজনের বন্ধু যখন সূর্য তখন পদ্ম এবং চক্রবাক এদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব অবশ্যই থাকবে দুজনে দুজনকে ভালবাসবে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে বিরুদ্ধ ব্যবহার। একজন আর একজনকে হিংসা করতে উদ্যত। পদ্ম (শ্রীকৃষ্ণের করপদ্ম) চক্রবাককে (রাধারাণীর বক্ষোজ) আচ্ছাদন করতে যাচ্ছে। যেন হিংসার ভাব। তাই মনে হয় এক বিচিত্র ব্যবহার। এর উপর আর একটি আর্শ্চর্য ঘটনা রাধারাণীর কর রক্তোৎপল তাকে বাধা দিচ্ছে। এটিও বিচিত্র। কারণ চক্রবাকের বিপক্ষ হল চন্দ্র কারণ চক্রবাক রাত্রে বিরহ ভোগ করে তাই চাঁদ চক্রবাক্রের শত্রু। কিন্তু সেই চাঁদ উৎপলের বন্ধু কিরণ চাঁদের কিয়ণ স্পর্শে উৎপল অর্থাৎ কুমুদ ফোটে তাই উৎপলের বন্ধু হল চাঁদ। রাধারাণীর কর (হাত) উৎপলের মত রাঙা সেই রক্ত উৎপল চক্রবাক্যকে আক্রমণ অর্থাৎ হিংসা করছে যে গোবিন্দের করপদ্ম তাকে বাধা দিচ্ছে। অর্থাৎ চক্রবাক তো রক্তোৎপলের মিত্র চাঁদের শত্রু তাকে সাহায্য করেছে আক্রমণকে বাধা দিয়ে তাকে রক্ষা করেছে মিত্রের শত্রূকে কেউ

সাহায্য করে না। মিত্রকেই সাহায্য করে তাই এই রক্তোপলের যে ব্যবহার এও বিচিত্র। এতগুলি আশ্চর্যজনক ঘটনা রাধাবেবিন্দের লীলায় এই কৌতুক রস আস্বাদন প্রসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। রসময় রসময়ী প্রেমময় প্রেমময়ীর লীলা প্রকাশের এমনই পরিপাটি।

রাধামাধব যে পথে চলেছেন পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে সে পথ তরুছায়ায় ঘেরা। ঘন ছায়া। কারণ পথের দুইপাশে সারি করে বড় বড় কেলিকদমের গাছ শোভা পাচ্ছে। প্রতিবৃক্ষের ঘন পাতায় ছাউনি নিবিড় হয়ে আছে। দ্বিপ্রহর কালে তাঁরা চলেছেন। কারণ শ্রীঝুলন লীলা প্রত্যেক দিনের লীলা তো বটেই উপরন্তু দ্বিপ্রহরের লীলা। আকাশে প্রচণ্ড সূর্যের কিরণ বনভূমিকে তপ্ত করছে। কিন্তু পথে ঘন পাতার ছায়ায় সেটি বড় একটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবু মাঝে মাঝে পাতার ফাঁকের মধ্যদিয়ে রবির সুদীপ্ত কিরণ রাধারাণীর আরক্তিম মুখখানির ওপরে পড়ছে তাতে কমলিনী কোমলাঙ্গী শ্রীমতীর মুখখানিতে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি রাধারাণীর মুখমণ্ডলে পড়ল তাতে প্রেমিক প্রবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন ব্যথায় ভরে উঠল রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা সুখ দেবার চেষ্ঠা করেন কারণ তার তো সকল চেষ্ঠাই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য—এর নামই প্রেম তিনি প্রেমিকা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক। তিনিও সর্বদা রাধারাণীকে সুখ দেবার প্রয়াসী কারণ প্রেম বা রস একদিকে হলে সুরস হয় না—দুইদিকে সমান হওয়া চাই। কিন্তু এ তো—পথের মাঝে লীলা নিভৃত নিকুঞ্জে যা সম্ভব সে পথে সম্ভব হবে কি করে? কিন্তু শ্রীগোবিন্দ তো রাধারাণীর ক্লান্তি অনুভব করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অথচ কোন উপায়ও খুঁজে পাচ্ছেন না। হঠাৎ মনে হল উপায় তো আছে। রাধারাণী কৃষ্ণের বামদিকে আছেন। গোবিন্দ তার মাথায় বৃহৎ মোহন চূড়া বাঁদিকে একটু হেলিয়ে দিয়ে রাধারাণীর মুখমণ্ডলের ওপর ছায়া বিস্তার করলেন। তার ফলে শ্রীমতী তৃপ্তি পেলেন—সূর্যোর কিরণ ঢাকা পড়ল। স্বেদমুক্ত হয়ে আনন প্রফুল্লিত হল।

বনপথে চলেছেন রাধাশ্যাম। শুধু তাদের চলা নয়-দুইজনেই নটনভঙ্গীতে চলেছেন। কারণ ব্রজের এইটিই মহিমা। তারা সহজে চলতে পারে না। নেচে নেচে চলে। তাদের গমনই নটন বচনই গান। চলতে নাচে বলতে গায়। এই স্বভাব গৌরসুন্দরে প্রকাশ পেয়েছে। পদকর্তা বলেছেন—গমন নটন লীলা বচন সঙ্গীত

কলা। বাক্‌পতি ব্রহ্মা বললেন কথা গানম্ নাট্যং গমনমপি. আজ দিকভাগে যুগলের গমনে এই নৃত্যভঙ্গি দর্শনে মনে হচ্ছে ভূমিতলে বিদ্যুত ও মেঘ প্রত্যক্ষভাবে পাশাপাশি মন্দমন্দ আগ্রসর হচ্ছেন—আর সেই মেঘ আর বিদ্যুতের ওপরে দুটি মুখচন্দ্র শ্যাম এবং পীতবর্ণ ধারণ করছেন—শ্যামসুন্দরের শ্যামবর্ণ মুখচন্দ্র আর তড়িতবরণী রাধারাণীর পীতবর্ণের মুখচন্দ্র শোভা পাচ্ছে। অপরূপ লাবণ্যে ভরা-অসমসুষমা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হওয়া তো স্বাভাবিক এ যে দিনের বেলা—মেঘ বিদ্যুৎনা হয় হতে পারে কিন্তু চাঁদের উদয় হবে কি করে? দিনে তো চাঁদ ওঠে না। আবার একটি চাঁদ নয়—দুটি চাঁদ শ্যামচাঁদ এবং পীতচাঁদ শ্যামের বদন এবং রাধার বদন যে দুটি চাঁদ তার প্রমাণ কি? প্রমাণ আছে। যুগলের আশেপাশে যে সেবা পরায়ণা সখীর দল চলেছে তাদের দৃষ্টি দেখলেই বুঝা যাবে। তাদেব নয়ন হল ইন্দীবর অর্থাৎ নীল উৎপল যা রাতের বেলায় চাঁদের কিরণ স্পর্শে ফোটে। সখীদের নয়ন ইন্দীবর প্রফুল্ল হয়ে আছে চাঁদের কিরণ না পেলে তো তা সম্ভব হবে না। তাই সহজেই প্রমাণিত হচ্ছে শ্যামের বদন চন্দ্রমা দর্শন করেই তাদের নয়নের এত আনন্দ এত উৎসব যেমন চাঁদের কিরণ স্পর্শে পেয়ে সরোবরে রাতে উৎপল (ইন্দীবর) আনন্দভরে ফুটে ওঠে কাজেই রাধারাণীর বদন পীতচন্দ্র এবং গোবিন্দের বদন শ্যামচন্দ্র বলতে কোন আপত্তিই নেই।

শ্যামসুন্দর এবং শ্যাম্‌মনোমোহিনী পথে চলেছেন সখীগণ সমভিব্যহারে। পথে যারা আছে সবাই তো তাদের দর্শন করছে। কিন্তু ভাব অনুযায়ী তো দর্শন হয়। সকলে তো একভাবে দর্শন করে না। যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে যার যেমন ভাব সে তেমনি বলে। পথে আছে চক্রবাক চক্রবাকী (চকাচকী) তারা দেখছে—শ্যামচাঁদ এবং পীতচাঁদ দুইখানি চাঁদের উদয় দেখে তাদের মনে তো বিষাদে ভরে গেল। কারণ চাঁদই তো তাদের বিরহের কারণ। রাতের বেলায় তো তাদের মিলন হয় না। চাঁদ দেখেই তাদের মন খারাপ হয়ে গেছে। তারা ভাবছে চাঁদ যখন উঠেছে আবার দুটি চাঁদ তখন তো গভীর রাত—এখন তো তাহলে আমাদের বিরহ সহ্য করতে হবে। তাই মন তাদের বিষন্ন। আবার রাধাশ্যামকে দেখছে ময়ূরের দল। তারা দেখছে মেঘবিজুরী জড়াজড়ি শ্যাম জলদ এবং রাধারাণী দামিনী—মেঘ বিদ্যুৎ দেখলে ময়ূর আনন্দে নাচে বনভূমিতে ময়ূরের দল এই মেঘ বিদ্যুতের শোভায় মুগ্ধ হয়ে আনন্দে পেখম তুলে নৃত্য করছে। হাঁসের দল যাচ্ছে

সেই পথে। তারাও দেখছে যে মেধ বিদ্যুতের খেলা তাতে তারা মনে করল মেঘ বিদ্যুৎ যখন তখন তো বর্ষাকাল এসে গেছে। বর্ষাকালে হাঁসেদের বড় ভয় কারণ চারিদিক জলে জলময়। হাঁসেরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে না ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হয়। তাই হাঁসেরা বড় ভয পাচ্ছে। আবার চকোরের দলও আছে সেই পথে। তাদের দৃষ্টিতে পড়ল দুইখানি চাঁদতাই তাদের মনে আজ পরমানন্দ। কারণ চকোরের খাদ্য তো চাঁদের সুধা। তারা চাঁদের সুধা ছাড়া আর কিছু পান করে না। দুখানি চাঁদের যখন উদয় হয়েছে তখন অনেক সুধা পান করতে পারব এই মনে কার তারা আনন্দে আত্মহারা। এখন মনে হতে পারে একই রাধাকৃষ্ণকে দর্শন করে ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব—কেউ সুখী কেউ দুঃখী, কেউ বা ভয়ে কাতর আবার কেউ বা আনন্দে বিভোর। তাহলে কি রাধাগেবিন্দের স্বরূপে বৈষম্য আছে! না তা নয়। সৃষ্টির মধ্যে যেমন সম বিষম আছে তাতে স্রষ্টার বৈষম্য দোষ বলা যাবে না—তেমনি রাধাগোবিন্দের ও কোন বৈষম্য নেই। এটি নিজ নিজ ভাবের প্রকাশ—এবং নিজের নিজের অনুভব অনুযায়ী আস্বাদন। ভক্তের কোন বৈষম্য দোষ থাকে না—ভক্তের দৃষ্টি সাধুর দৃষ্টি সকলের প্রতি সমান—তাই তাদের সমদর্শী বলা হয়। তাহলে ভগবানের স্বরূপে বৈষম্য থাকবে কি করে। ব্রহ্মসূত্র বলেছেন—'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যান্ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।'

শ্রীশ্রীঝুলনলীলার স্থান হল বর্ষাহর্ষবন। সেই দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছেন রাধামাধব। অভীষ্ট পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বনদেবী বৃন্দা—চল রসিকেন্দ্র রসিকামণি এই পথে চল এই পথে চল। যুগলও পরমানন্দে প্রেমভরে বিবিধ রহস্য প্রসঙ্গ রঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন আর নিজেদের স্বরূপের অপূর্ব শোভায় বনভূমির সৌন্দর্য্য আরও বাড়াতে লাগলেন—এতে বনভূমির সৌন্দর্য্য যেন বাড়ল। অবশেষে তারা নিদিষ্ট পথে বর্ষাহর্ষ নামে বনে এসে শোভা পেতে লাগলেন। বর্ষাহর্ষবনের ওপরে আকাশমার্গে তখন মেঘ বিদুত্যের খেলা চলেছে। যেই বনভূমিতে রাধাসৌদামিনী এবং শ্যাম জলধর এসে পৌছুলেন তখনই আকাশের মেঘ বিদ্যুতের দৃষ্টি তাদের ওপর পড়ল। তখন আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হতে পারে আকাশের মেঘ বিদ্যুৎ কি রাধাবিদ্যুৎ আর শ্যামমেঘের সঙ্গে সমান হবার জন্য অকাঙ্ক্ষা করেছে? তাদের কি মনে হয়েছে আমরাও এদের সমান (সমতুল্য) হব গ্রন্থকার শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ আস্বাদন করছেন না, একথা তাদের একবারও মনে

হয় নি। কারণ তা কি করে হবে? কারণ তারা কোথায় আর এরা কোথায়? আকাশের মেঘ তো একটি আর বিদ্যুতও একটি। আর ভূমিতলে যে রাধাবিদ্যুৎ এবং কৃষ্ণমেঘ— সে তো অসংখ্য সে তো অপরিমিত। রাধারাণীর প্রতি অঙ্গে অসংখ্য বিদ্যুতের শোভা অসংখ্য দামিনীর ঝলক আর শ্যামসুন্দরের প্রতি অঙ্গে অসংখ্য মেঘের খেলা নবজলধরের অপূর্ব্ব অপরিমিত শোভা। সুতরাং এখানে সমতুল্য হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষার কোন সম্ভাবনা নেই। ভূমিতলে রাধাসৌদামিনী এবং শ্যামজলধর যখন বনভূমিকে শোভায় উদ্ভাসিত করে চলেছেন তাই দেখে আকাশের বিদ্যুত মেঘ চিন্তা করতে লাগল এরা নীচে রয়েছেন আর আমরা এর ওপরে রয়েছি এটি তো ঠিক হচ্ছে না কারণ গুরুজন নীচে থাকলে তো ওপরে থাকা চলে না সেটি শোভা পায় না। কারণ তাতে মহদতিক্রম অর্থাৎ মহাজনের মর্য্যাদার হানি হয়। সেটি মহান অপরাধ। কিন্তু এই অবস্থায় আমরা কোথায় বা যাই? কারণ সমস্ত আকাশে মার্গে তো এঁদের কান্তিমালায় ছড়িয়ে পড়েছে এই কথা ভাবতে ভাবতে তারা ভয়ে দুঃখে কাঁপতে লাগল—তখন তারা পাণ্ডুর বর্ণধারণ করল আর মাঝে মাঝে জলধারা বর্ষণ ছলে যেন কাঁদতে লাগল। ঘটনাটি হল—বর্ষার মৃদু মৃদু বর্ষণ হচ্ছে মাঝে মাঝে এবং মেঘের বর্ষণ হলেই মেঘের ঘনকালো অবস্থা আর থাকে না রং একটু সাদা অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যায়। লীলারসামোদী গ্রন্থাকার সেটিকে আস্বাদন করেছেন—এ পাণ্ডুবর্ণ হল ভয়ে আর দুঃখে জলধারা বর্ষণ হল ক্রন্দন। আকাশের বিদ্যুৎ ও মেঘের এই অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তারা রাধাশ্যামের কিছু সেবা করতে চায়। বহু সৌভাগ্য না হলে মনের মধ্যে সেবাপ্রবণতা জাগে না। তারা দেখছে বনভূমির পথে রাধামাধব দ্বিপ্রহরে রবিকিরণ স্পর্শে তাপ পাচ্ছেন—এঁদের একটু সেবা করি। এঁদের মাথার উপরে যদি ছাতা ধরতে পারি তাহেল তাপ দুর হবে। তাতে তাঁদের সুখ হবে সেবা মানে তো সুখ দেওয়া। তখন বিদ্যুৎ হল ছাতার সোনালী বাঁট আর মেঘ নিজেকে বিস্তার করে কালো ছাতা হয়ে রাধামাঘবের মাথার ওপর ধারণ করেছে। অপরূপ শোভা হয়েছে। মেঘ বিদ্যুৎ এই সেবাসৌভাগ্য পাওযার আনন্দ ভরে বৈবর্ণ্য অর্থাৎ পাণ্ডুবর্ণ, বর্ষণ ছলে ক্রন্দন আর মেঘের মৃদুমধুর গম্ভীর গর্জনে যেন মন্দ্রধর্বান দিয়ে গদগদবাক্যে শ্রীরাধাশ্যামের স্তুতি করতে লাগল। গ্রন্থকার আস্বাদন করছেন—আকাশের মেঘ এবং বিদ্যুত এই প্রেমসেবা লাভের ফলে সাত্ত্বিক বিকার বৈবর্ণ্য অশ্রু এবং গদগদ ভাষ লাভ করল।

বৃন্দাবনের বর্ষাহর্ষবনের অসম মাধুরী দর্শন করতে করতে শ্রীরাধাগোবিন্দ কদমকাননে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কদমতরুর উঁচু উঁচু শ্যামশোভন সহস্র সহস্র শাখায় ফুটে আছে পীতকদমকুসুম এবং তার থেকে মৃদু মন্দ মকরন্দ বিন্দু ঝরে পড়ছে—জায়গাটিকে সৌগন্ধে আমোদিত করে রেখেছে। আ মরি মরি। কি সুন্দর। দেখলে মনে হয় তারা যেন দামিনী দাম মণ্ডিত নবঘনের শোভাকে জয় করে এক বিচিত্র মাধুরীর বিকাশ করেছে! সেই কদম কাননের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ মণিময় কুট্টিম অর্থাৎ বেদি এই অসংখ্য বেদি সারি সারি সাজানো আছে। দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আনন্দের কেয়ারীরূপে শোভা পাচ্ছে। আনন্দঘন শ্রীমদনমোহনের অসামান্য আনন্দকে কে যেন নিবিড় করে এই বেদিগুলিকে কেয়ারী করে রেখেছে। এই বেদির ওপরে ঝরে পড়ছে কদম কুসুমের মকরন্দ মধুধারা। তাতে দিবানিশি তারা সিঞ্চিত হচ্ছে—এত সম্পদ রয়েছে সেখানে তো তার রক্ষা বিধানের জন্য অতন্দ্র প্রহরী দরকার। সে প্রহরীর কাজ করছে এখানে মনোমুগ্ধকর ভ্রমরের দল—তারা তো সদা জাগ্রত। মধুর গুণ গুণ রবে আনন্দের কেয়ারীর রক্ষাবিধান করছে। এদের পাহারায় এরা সর্বদা সুরক্ষিত হয়ে আছে। এই অসংখ্য বেদীর প্রত্যেকটি বেদীর দুই প্রান্তে দুটি করে কুসমিত কদমতরু স্তম্ভের মত শোভা পাচ্ছে—প্রতি বৃক্ষে অসংখ্য কদম ফুল ফুটে আছে। আর বৃক্ষ দুটির ভঙ্গী এমনই যে তাদের উন্নত শাখা বিপরীতমুখী হয়ে আছে যেন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। ফলে উপরে ঘন পাতার ছাউনিতে দেখাচ্ছে গোপানসী অর্থাৎ বাঙ্গালা ঘরের মত। আমাদের দেশে খড়ে ছাওয়া ঘরকে বাঙ্গালা বলা হয়। সেইরকম দেখাচ্ছে। কুসুমে শোভিত এই গোপানসী দেখে মনে হচ্ছে যেন মরকতমণি শোভিত বলভী শ্রেণী অর্থাৎ চিলেকোঠার ঘর। আবার তার থেকে অসংখ্য ফোটা কদম মালার আকারে নীচে দোদুল্যমান। এমনই শোভা করে আছে যে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। এই অগণিত বেদীর ওপরই তো হিন্দোলা লীলার আস্বাদন হবে। তাই সেবাপরায়ণা বনদেবী আগে থেকেই তার সুব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই বেদির প্রান্তভাগে যে দুটি দুটি কদমগাছ—তার শাখাতে শাখাতে বাঁধা রয়েছে রক্তবর্ণ পট্টসূত্রে শোভন মুক্তা মালায় গাঁথা রজ্জু দিয়ে আবদ্ধ দুটি দুটি সুবর্ণ পাটাযুক্ত হিন্দোলা অর্থাৎ ঝুলনা। কদমকাননে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে—সে বাতাস কদমের সৌরভে সুরভিত সেই বাতাসের স্পর্শে এই

দোলনাগুলি মৃদুমন্দ আন্দোলিত হচ্ছে। লীলার নিত্যতায় এই দোলনাগুলিও নিত্যই শোভা পাচ্ছে। এ শোভার তুলনা হয় না। এই দোলনাগুলিকে আবার সেবাপরায়ণা সখীরা সাজিয়েছেন সুখভোগ্য করে। কারণ তাদের তো সেবাই প্রাণ। তারা প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীকে সুখ দিতে জানে। তারা সব ললিত কলাকুশলা। তাই সুগন্ধি কোমল কুসুম বেছে তুলে এনেছে। তার থেকে একটু কঠিন অংশ যে বোঁটা (বৃন্ত) তা খুলে ফেলে দিয়েছে। কারণ তা প্রাণপ্রিয় প্রাণপ্রিয়ার সুকোমল অঙ্গে আঘাত দেবে, শুধু কোমল পাপড়িগুলি একজায়গায় জড় করেছে—তাতে আবার মাখিয়ে দিয়েছে ফুলের সুরভিত রেণু (পরাগ)- সেই অতি কোমল সুবাসিত রেণু সিঞ্চিত পাঁপড়ি বিছিয়ে দিয়েছে প্রতি হিন্দোলায়—তার ওপরে দিয়েছে সুকোমল সূক্ষ্ম বসনের আবরণ—যাতে রাধামাধবের সেখানে বসে সুখ হয়। এইভাবে অসংখ্য হিন্দোলা তখন সৌরভে এবং সৌকুমার্য্যে রাধামাধবকে আকর্ষণ করতে লাগল। সাধন পথেও ভক্ত তাই নিজের অন্তরকে ভক্তি সৌরভে কোমলতায় সাজিয়ে রাখে যাতে প্রাণপ্রিয় ভক্তিবশ ভগবানের আকর্ষণ হয়।

এখন অসংখ্য হিন্দোলার মধ্যে কোন হিন্দোলায় উঠবেন তাই চিহ্নিত করবার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দোলিকা দেখে শ্রীশ্যামসুন্দর তার ওপর উঠলেন এ হিন্দোলার বৈশিষ্ট্য কি—এখানে মনোহর পতাকা শোভা পাচ্ছে। এতে মনে হতে লাগল যেন শোভা দেবীর সেব্যমানা হিন্দোলার ওপর মূর্ত্তিমান আনন্দ সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত হলেন। শ্যাম সুন্দর একা দোলনায় উঠেছেন—আনন্দঘন উঠেছেন বটে কিন্তু আনন্দ পাচ্ছেন না—কারণ একা একা আনন্দ হয় না। আনন্দের পূর্ণতা হয় না। কারণ আনন্দের পাশে সেই আনন্দকে আস্বাদন করবার জন্য আস্বাদক চাই। রসরাজ্যের এইটিই নিয়ম—রস এবং রসিক দুই চাই। শুধু রসের আস্বাদন হয় না। রসিকের অভাবে রস অপূর্ণ থেকে যায়। মিছরির কুঁদোর পাশে যদি আস্বাদনের জন্য জিহ্বা না থাকে তাহলে মিছরি যে মিষ্টি এটি বলবে কে? শিশুর পাশে যদি পিতামাতার বাৎসল্য না থাকে তাহলে শিশুর আদর হয় না। আস্বাদ্য এবং আস্বাদক দুইই চাই। তা না হলে রস সম্পূর্ণ হয় না। সৃষ্টির মূলেও তাই। ভগবান একা ছিলেন—তখন তার মনে হল একা থেকে সুখ হচ্ছে না। আমি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করব। একোহহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়েয়। এইভাবে সৃষ্টির প্রকাশ। তাই হিন্দোলায় শ্যামসুন্দর আজ আনন্দ বর্ষায় অভিষিক্ত হতে চান তিনি

সেবাপরায়ণা সখীদের ইঙ্গিত করলেন। কারণ রাধারাণী তো শালীনতার মূর্তি। তিনি তো নিজে থেকে দেলনায় উঠবেন না। শ্যামসুন্দরের সুবর্ণ পাটার সামনে ঐ হিন্দোলায় আর একখানি সোনার পাটা। সখীরা রাধারাণীর কটিদেশ ধরে পেছন থেকে তাকে হিন্দোলায় তুলে দিলেন রসিকশেখর ও তাকে হাত দিয়ে আকর্ষণ করে হিন্দোলিকার ওপর নিজের সামনে বসালেন। অপরূপ মনোহর এ রূপদর্শনে মনে হলো যেন মুর্ত্তিমন্ত আনন্দকন্দ মাধব বিনিদ্রপ্রেমের স্বরূপ যে শ্রীমতী রাধিকা সেই প্রেমের সরসীকে যেন নিজের সামনে স্থাপন করলেন। এতক্ষণে আনন্দ সম্পূর্ণ হল। আস্বাদকের অভাবে আস্বাদ্য শ্রীহীন হয়ে পড়ে— তার আদর হয় না ঃ আমাদের এ জগতে রাধামাধবের ঝুলন লীলা অনুষ্ঠানের দেখা যায় তারা পাশাপাশি বসেন হিন্দোলায়। কিন্তু এখানে গ্রন্থকার নিত্যলীলার আস্বাদন করেছেন—তাঁরা বসেছেন সামনা সামনি। শ্যামসুন্দরের সামনে শ্যামমনোমোহিনী—এতে শোভা তো বেশি হয়েইছে উপরন্তু দর্শনের আনন্দ বেশী। কারণ পাশাপাশি বসলে ভালদর্শন হয় না দর্শনে তেমন সুখ হয় না কিন্তু সামনাসামনি বসলে দর্শনে সুখ আর তাতে আনন্দও বেশী হয়। দুখানি সোনার পাটা সামনাসামনি। সোণা মূল্যবান বটে কিন্তু কঠিন তার স্পর্শ তাঁদের কোমল অঙ্গে আঘাত পাবেন এই আশঙ্কায় সেবারতা সখী কিঙ্করীরা মনের মত বৃন্তচ্যুত ফুলের গদি করে সেই সোনার পাটা ঢেকে দিয়েছেন এ সুখময় সুরভিত কোমল স্পর্শে আনন্দময় আনন্দময়ীর অপার আনন্দ উছলে উছলে উঠেছে। তাঁরা যখন হিন্দোলায় সমাসীন তখন সময় বুঝে সখীগণ সময়োচিত সমুধুর গান করতে করতে পুষ্পের আরতি দিয়ে রাধাশ্যামের বদন কমলের সমাদর করতে লাগলেন, সখীরা সকলেই সুকণ্ঠিনী তাই এই গান এবং আরতিতে যুগলের বড় সুখ হতে লাগল। দোলনায় উঠবার সময় দুজনেরই মোহন চূড়া বক্ষের হার, কানের কুণ্ডল বা অন্যান্য অলঙ্কার কিছু অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছিল এটি স্বাভাবিক। তাই সখীরা তো সকলেই সেবা সুখে সুখী তখন সে অলঙ্কার যথাযথ সুবিন্যস্ত করে তাঁদের শ্রান্তি দূর করবার জন্য সুবাসিত পানের খিলি বদনে দিলেন তারপর মাল্যাচন্দনে তাঁদের আবার সুসজ্জিত করে দিলেন। নিজের নিজের নয়নকে যেন তাঁরা বলছেন এ অপরূপ শোভা একবার নয়নভরে দেখে নে— কারণ আর সময় হয় কি না হয়।

দোলায় উঠেছেন যুগলকিশোর। এইবারে দোলা দোলাতে হবে। তখন হিন্দোলায়

দুই পাশে দুই প্রাণসখী দাঁড়ালেন। তাঁদের পরণে পট্টশাড়ী আর কটিদেশে কাঞ্চী—শাড়ীর আঁচলের প্রান্তভাগ কাঞ্চীর সঙ্গে বেঁধে দিলেন। কারণ দোলা দোলাবার সময় শাড়ীর আঁচল অবিন্যস্ত হওযার সম্ভাবনা বেশী। তাই আগে থেকে সাবধান হয়ে প্রস্তুতি নিয়েছেন। আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দোলনা দোলান সুবিধা হয় না—তাতে ঠিক দোলনা দোলান যায় না। তাই তাঁরা চরণ দুখানি আগুপিছু (অগ্রপশ্চাৎ) করে দাঁড়ালেন—এতে একটু কুব্জীভূত হওয়ায় দোলা ধরে দোলনায়—সুবিধা হল। সখী দুজন মনের আনন্দে দুইপাশে এইভাবে দোলা ধীরে ধীরে দোলাতে লাগলেন। নিজের নিজের সেবা থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না। তাই আর দুজন সখী সুচারুতাম্বুল বীটিকা হাতে নিয়ে দোলার দুই পাশ থেকে সাবধানে তাঁদের বদনে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কারণ দোলে যখন দ্রুতগতিতে দোল তখন তো দেবার সুবিধা হয় না। তাই যখন দোলার বেগ একটু কমে আসে তখন সেই সুযোগ পেয়ে সেই অবসরে তাঁরা শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর বদনকমলে সুবাসিত পানের খিলি দিচ্ছেন। এর মধ্যে আবার কুতুকী কৃষ্ণ কৌতুক করবার জন্য সখীদের বলছেন—তোমরা দোলা দুলিও না। আমি নিজেই দোলাব। সখীরা তখন দোলা ছেড়ে দিলেন। রাধাশ্যাম নিজেই দোলা দোলাতে লাগলেন এবং এত বেগে দোলাচ্ছেন যে তখন সখীরা আর পানের খিলি দিয়ে সেবা করবার সুযোগ পাচ্ছেন না। এরপরে প্রেমমূর্ত্তিমতী প্রধানা সখী ললিতাজী এবং তাঁর সঙ্গিনী আরও কয়েকজন আনন্দে বিভোর হয়ে সুরভিত ফুলের রেণু অঞ্জলি ভরে নিয়ে রাধামাধবের ওপর বর্ষণ করতে লাগলেন। এ শুধু ফুলের পরাগ নয় তাতে মেশানো আছে তাদের অন্তরের রাগ অর্থাৎ অনুরাগ যুগলের প্রতি যে তাদের ঘন ভালবাসা প্রীতি তা মাখানো আছে সেই পরাগ যখন যুগলকে স্পর্শ করছে তখন সখীরা ভাবছেন আমাদের অন্তরের অনুরাগই তাঁদের অঙ্গকে স্পর্শ করল। সে মাধুরী দর্শন করে যেন তাঁদের পিয়াস মিটছে না—নয়ন চকোর সে রূপসুধায় ডুবে গেছে জনম সার্থক বলে মনে হচ্ছে।

এতো হল ভূমিতলে সখীদের অবস্থা। রাধারশ্যামের যুগল মাধুরী কে না আস্বাদন করতে চায়? আকাশ পথে বিমানে করে দেববধূগণ যাচ্ছেন। বনভূমির দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়ল—তাঁরা এই হিন্দোলা লীলা দর্শন করে মনে করতে লাগলেন—আমাদের আজ অহো ভাগ্য! এ ভাগ্যের তুলনা হয় না কিন্তু দেবীদের মনের

একান্ত ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করবার। কিন্তু তাতো কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী মহালক্ষ্মীই এ ব্রজরসে বঞ্চিত্য। অন্য দেববধূদের কা কথা। কারণ গোপীদেহ ছাড়া গোপেন্দ্রনন্দন আর কোন দেহ স্পর্শ করেন না, গোপী আনুগত্য ছাড়া এ ব্রজরস আস্বাদনে কারও অধিকার নেই। দেবীরা নিজেদের অভিমান ছেড়ে ব্রজের গোপনারীদের আনুগত্য করতে পারেন না তাই তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গসুখ সুদূর পরাহত। তবে কথা আছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। তাই দেবীরা সাত্ত্বিক ভাবাবেশে কুসুম স্তবক নিয়ে তার সঙ্গে মনের অনুরাগ মিশিয়ে রাধামদনমোহনের ওপর বর্ষণ করতে লাগলেন। তাতেই মনের যেন অনেকটা তৃপ্তি অনুভব করলেন।

রাধাশ্যাম দোলনায় দুলছেন—কখনও ধীরে কখনও দ্রুত বেগে। আকাশের মেঘমালা একদৃষ্টে তাঁদের পানের চেয়ে আছে মৃদু মৃদু জল কণা বর্ষণ করতে লাগল। সেই জল কণা পড়ছে ব্রজাঙ্গনাদের দিব্য অঙ্গে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন ব্রজবধূদের অঙ্গে মুক্তাভূষণের শোভা। জলকণা যেন ব্রজবিলাসিনীদের অঙ্গে মুক্তার অলঙ্কারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে গর্ব অনুভব করতে লাগল, রাধামাধবের লীলার সহায়কারিণী সখীগণ মনে মনে ভাবছেন এসময় যদি একটু সুরতাল লয় যোগে গান গাইতে পারতাম তাহলে রাধাশ্যামের আনন্দ বাড়ত। তারা সকলেই সুকণ্ঠিনী সুযন্ত্রিনী—কিন্তু তাদের কণ্ঠ আছে কিন্তু যন্ত্র তো কাছে নেই। বীণা মুরজ মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্র ছাড়াই তারা শুধু কণ্ঠে সুমধুর গান করতে লাগলেন। এই গান এতই মনোমুগ্ধকর যে তার লয় মূর্চ্ছনা দেবলোকে গিয়া পৌছুলো। তাঁরা যখন গান করছেন তখন তাদের বদনকমল একটু বিস্তৃত হয়েছে—যাকে জৃম্ভা বলা হয়। সেই জৃম্ভা প্রকাশে অপরূপ সৌরভ প্রকাশ পেতে লাগলো। যার ফলে স্থানটি আমোদিত হয়ে গেছে। সুগন্ধে ভ্রমরের আকর্ষণ হয় অলিকুল পরিমল লোভে সেখানে এসে তাদের শ্রীমুখকমলের কাছে ঘিরে ঘিরে গুঞ্জন করতে লাগলো। তাদের গুঞ্জনে মনে হচ্ছে যেন তারা ব্রজসুন্দরীদের শ্রীমুখের স্তুতি কীর্তন করছে। প্রসিদ্ধি আছে সুন্দরীদের সুরভিত নিঃশ্বাসে বকুল ফোটে পদাঘাতে অশোক মঞ্জুরিত হয়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলাবিহার যতই বাড়ছে তাদের আনন্দ চন্দ্রও যেন ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দোলার দোলনের তালে তালে রাধামাধবের অঙ্গের বেশভূষা হার

তাটঙ্ক মাল্য সব নৃত্য করতে লাগলো। নাচ তো বাজনা ছাড়া মানায় না। তাদের এ নৃত্যের সাথে তাল দিয়ে বাদ্য বাজাচ্ছে কে? রাধাশ্যামের শ্রীচরণের নূপুর কটিদেশের কিঙ্কিনী তখন আপনা থেকেই বেজে উঠলো তারাই যেন বাদক নৃত্যের তালে তালে বাজাচ্ছে। এখন যেখানে নৃত্য গীত বাদ্য সেখানে দর্শক অর্থাৎ সভ্য না থাকলে তার আদর হয় না। কারণ বড় তালের গান হচ্ছে যদি সমঝদার না থাকে নাচ বাজনা হচ্ছে—তাকে সমাদর করবার কেউ যদি না থাকে তাহলে মানায় না। এখানে তাই দর্শক সমঝদার কে? গ্রন্থকার রসিক তাই আস্বাদন করেছেন—যুগল কিশোরের বদনকমলের মৃদু হাসি যাকে স্মিতি বলা হয়—অধরকোণে হাসি উঠে আবার অধর কোণেই মিলিয়ে যায়—সেই হাসিই আজ সভ্যরূপে শোভা পেতে লাগলো।

শ্রীরাধাশ্যাম হিন্দোলার ওপর আনন্দে দুলছেন। আর সেই দোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অঙ্গের অসীম সুষমারাশিও যেন ঝলকে ঝলকে দুলছে। মাধুরী শতধারে উচ্ছলিত হচ্ছে। তাঁদের বদনচন্দ্রমার দিকে চেয়ে আছেন। এ অপরূপ শোভা যেন তাঁদের নয়নভরে ও সুষমা দর্শন করে যেন মনে করলেন আমরা প্রচুর বৈভব লাভ করে ধন্য হয়েছি। আনন্দময় নাগরেন্দ্র এবং আনন্দময়ী নাগরীমণি নিজেরা তো আনন্দসাগরে ডুবে আছেন যাঁরা তাঁদের স্পর্শে এসেছেন যাঁরা দর্শন করেছেন সে রূপসুধা পান করেছেন তাঁরাও বিভোর হয়ে গেছেন। শ্রীরাধাশ্যাম এইভাবে লীলারসে কামনা জাগতে পারে কিন্তু তাঁদের স্বরূপই এমন যে সেখানে কোন কামনার স্থান নেই। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হতে পারে এখানে তো তাঁদের কামনার স্থান নেই। কারণ এদের হল অনাবিল প্রেম-প্রেমের কাছে কোন কামনার স্থান নেই। প্রেম হল নির্মল ভাস্কর আর কাম হল অমানিশার অন্ধকার। আলো যেমন অন্ধকারকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না আলো থেকে যেমন অন্ধকার বহুদূরে সরে থাকে এখানেও তাই—কামনা প্রেমকে স্পর্শ করে না। কামনা তাই হিন্দোলা লীলার কোন বিঘ্ন ঘটাতে পারল না।

প্রতি হিন্দোলার বেদীর দুইপাশে দুটি কদমগাছ তাতে ফোটা কদম ভরা। সেই কদমগাছের শাখাতেই রজ্জু দিয়ে দোলনা বাঁধা আছে। দোলনার দোলায় তালে তালে গাছের শ্যামশাখাও দুলছে। সখীরা যেমন রাধামাধবকে চামর ব্যঞ্জন করে সেবা করেন এখানেও মনে হচ্ছে যে এই তরুশাখা (ফুলে ফুলে ছাওয়া)

রাধামাধবকে চামর ব্যঞ্জন করে সেবা করছে। কারণ সেব্যকে সামনে পেলে কার না সেবা করার লোভ জাগে? এই সেবা সৌভাগ্য যারা পায় তারা ধন্য হয়ে যায়। এই তরুশাখার পাতার মাঝে মাঝে অপূর্ব গাঁথা অসংখ্য মালা রয়েছে— এতে হিন্দোলার শোভা আরও বেড়েছে। দোলনার তালে তালে সে মালাও দুলছে। মালায় ফুলের সৌরভে ভ্রমরের দল আকৃষ্ট হয়ে ছুটে গিয়ে তা ধরতে যাচ্ছে কিন্তু বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ধরতে পারছে না কারণ দোলা অতিদ্রুত বেগে দুলছে। অলিকূল সেখানে ঘুরে ঘুরে গুঞ্জন করে বেড়াতে লাগল মালা দেদোলারা তালে তালে তার পেছনে পেছনে যখন ভ্রমরের দল গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তখন এ শোভার তুলনা হয় না। যাদের এ মাধুরী দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে তাদের নয়নের পরম মহোৎসব।

এখন রাধারাণী এবং রাধারমণ দোলাকে আরও বেগে দোলাবার ইচ্ছা করলেন ধীরে ধীরে দোলানাতে যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। তখন নিজেদের চরণ যুগল ভূমিতে রেখে একবার দেহকে নীচু করে আবার একবার উঁচু করে দোলার বেগ ক্রমশ বাড়াতে লাগলেন। অতি দ্রুতগতিতে দোলা দুলতে লাগল এ দোলন কৌশল দর্শন করে সখীরা মুগ্ধ হলেন। তাদের আনন্দ আর ধরে না! শ্রীরাধাশ্যামের দোলার ওপর পরস্পর সামনাসামনি বসেছেন। দোলা তো পর্য্যায়ক্রমে দুদিকে বেগে দুলছে। একবার রাধারাণীর দিক আবার একবার শ্যামসুন্দরের দিক ওপরে উঠছে তখন রাধারাণী ওপরে আর নীচে শ্রীকৃষ্ণ। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের দিক ওপরে উঠছে তখন ওপরে শ্রীকৃষ্ণ আর নীচে রাধারাণী। এইভাবে যুগল কিশোর পর্য্যায়ক্রমে ওপরে নীচে সখীরা নয়নভরে সে অমৃত আস্বাদন করেছেন পিয়ে পিয়ে পান করছেন। যতই পান করছেন ততই তৃপ্তি যেন আর হচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন নীচে তখন রাধারাণীর বক্ষের হার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ স্পর্শ করে নাচতে লাগল। আবার যখন রাধারাণী নীচে তখন শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের বৈজয়ন্তী মালা শ্রীরাধার কাঁচুলি স্পর্শ করে মনোহয় ভাবে নৃত্য করতে লাগল। এ দৃশ্য দর্শন করে সখীদের আনন্দ আর ধরে না। হিন্দোলায় আজ নবঘন শ্যাম এবং কনককান্তি রাধারাণী সমাসীন। একজন যেন মরকত মুকুর আর একজন কনকমুকুর। শ্যাম নীল কান্তমণি আর রাই আমাদের কাঁচা সোনা। অপূর্ব শোভা। দুখানি স্বচ্ছ দর্পণ সামনাসামনি। কান্তকে দেখবার জন্য কান্তার লোভ আবার কান্তাকে দেখবার জন্য কান্তেরও লোভ। এটি তো

স্বাভাবিক। সেই লোভে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গমুকুরে দৃষ্টি দিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হল না। স্বচ্ছ মুকুরে রাধারাণী নিজেরই প্রতিবিম্ব দর্শন করলেন। আবার কান্তাকে দর্শন করার লোভে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কনকগৌরী শ্রীরাধার অঙ্গমুকুরে দৃষ্টি দিলেন। দৃষ্টি দিলেন বটে কিন্তু রাধারাণীর দর্শন পেলেন না—স্বচ্ছতায় নিজেরই নটবর মূর্ত্তি দর্শন হল এইবার শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার দর্শন পেলেন না আবার রাধারাণীও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন না তখন দুজনেরই মনের মধ্যে অদর্শনের জ্বালা উদ্দীপ্ত বিরহে মর্মদাহী দুঃখে তখন দুজনেরই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দীর্ঘশ্বাস পড়লেই তখন একটা বাতাস বয়ে যায়—এঁদেরও দীর্ঘশ্বাসে একটা বাতাস প্রবাহ দুজনের অঙ্গকান্তির ওপর দিয়ে খেলে গেল। ফলে অঙ্গদর্পণ দুখানি বিষাদের ছায়াপাতে একটু মলিন হয়ে গেল অর্থাৎ এতখানি স্বচ্ছ আর রইল না একটু যেন ঝাপসা হয়ে গেল। তখন দুজনে দুজনের প্রতিবিম্ব আর দেখলেন না। দুজনে দুজনকে দেখে আনন্দে বিভোর হলেন, শ্যামসুন্দর রাধারাণীকে এবং রাধারাণীও শ্যামসুন্দরকে দর্শন করলেন। রাধামাধবের এ লীলা নিত্যা। কিন্তু এর থেকে জীবজগৎ সাধক জগৎ ভক্তজগৎ সাধনামার্গের একটি দিক পেয়ে গেল। ভগবানের দর্শনের জন্য যদি নিরন্তর উৎকণ্ঠা জাগে এবং এ উৎকণ্ঠা জাগবে যত ভজন করা যাবে তবে শুধু ভজনে হবে না তার সঙ্গে যদি ভগবানের কৃপা হয় তাহলে উৎকণ্ঠা জাগে এবং উৎকণ্ঠায় যখন দীর্ঘশ্বাস পড়বে যখন মনের মধ্যে হায় হায় করবে তখনই উৎকণ্ঠার দর্শন এবং এই দর্শনই সুন্দর। আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরু মহারাজ শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের বাণী—

শুধু মুখের কথায় কি গৌর মেলে
এমন তিলে তিলে না ভজিলে শুধু মুখের কথায় কি গৌর মেলে
এমন ব্যাকুল প্রাণে না ডাকিলে শুধু মুখের কথায় কি গৌর মেলে।

দোলা তো দুলছে। কিন্তু নাগরেন্দ্রর যেন কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না। দোলার বেগ ক্রমশ বাড়াতে লাগলেন। ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে দোলার বেগ এতই বেগে উঠল যে দোলা খুব উঁচুতে উঠছে তখন রাধারাণী হিন্দোলার এত ওপরে উঠছেন যে কদম তরুর উঁচু উঁচু পাতার গুচ্ছ রাধারাণীর পিঠে লাগছে তার ফলে কোমলাঙ্গী রাইকমলিনী পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অত্যন্ত ভয় পাচ্ছেন। রাধারাণীর এই ভীত অবস্থা দেখে লীলাসাগর নাগরমণি কৌতুক অনুভব করছেন। শ্যামনাগর

নিজেই দোলা দোলাচ্ছেন বলে সখীরা দোলা ছেড়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা রাধারাণীর এইরকম ভীতি বিহ্বল অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে মদন মোহনকে বলতে লাগলেন ওগো নিঠুর, ওভাবে জোরে আর দোলা দুলিও না দোলা থামাও দোলা থামাও—রাধারাণী আরও ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু সখীদের এ কথা শ্রীকৃষ্ণ কানেই তুলছেন না—দোলা থামান তো দূরের কথা বেগ আরও বাড়াতে লাগলেন। রাধারানীর ভয় পাওয়া দেখে গোবিন্দ বরং হাসতে লাগলেন। দোলার এই দ্রুতগতির ফলে শ্রীমতীর মাথার বেণীবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। অবগুণ্ঠনও (ঘোমটা) আর রইল না। শ্রীঅঙ্গের হার বলয় নূপুর সব ভূষণই বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বায়ুর বেগে বাইরের শাড়ী আঁচল তো উড়ছেই—অন্তরীণ বাস ও পাছে উড়ে যায় এই আশঙ্কায় প্যারীজী দুই চরণ দিয়ে নীচের শাড়ীর প্রান্ত ভাগ চেপে ধরেছেন কিন্তু বাতাসের অত্যন্ত বেগে সেটি ধরে রাখাও আর সম্ভব হল না। শ্রীরাধার এই বিবশ ব্যাকুল অবস্থা যতই বাড়ছে বিদগ্ধ নাগর চতুর চূড়ামণি ততই বারে বারে হাসতে লাগলেন। অপরূপ রসের আস্বাদন।

এখানে মনে হতে পারে জীব (মানুষ) এ জগতে ভয় নিবারণের জন্য অভয় গোবিন্দ পাদপদ্ম ভজনা করে। মহাজন বলেছেন—

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয়চরণাবিন্দরে। আর শ্রীগোবিন্দ মনোমোহিনী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীগোবিন্দের কাছে থেকে ভয় পাচ্ছেন কি করে। এখানে লীলায় রাধারানী ভয় পাচ্ছেন তত্ত্বে তাঁর ভয় পাবার কথা নয়—কিন্তু লীলায় ভয় পান—এতে রসের পুষ্টি। লীলার সঙ্গে তত্ত্বকে মেশান চলবে না—অথচ তত্ত্ব ছাড়া লীলাও হবে না। কারণ তত্ত্ব হল সত্য। সত্যের ওপরে লীলার স্থান মিথ্যার ওপর লীলা হয় না। কিন্তু মজা এমনই যখন লীলারসের আস্বাদন করবেন রসিক জন তখন তত্ত্ব জেনেও ভুলে যেতে হবে। কারণ লীলারসের আস্বাদনের সময় যদি মনের মধ্যে তত্ত্বকথা উঁকি মারে তাহলে আর লীলারসের আস্বাদন হবে না। লীলা রসামোদীর তত্ত্বকথা জানা চাই তা না হলেও লীলার আস্বাদন হবে না। তত্ত্ব না জানলে লীলা কথা গল্পকথা প্রাকৃত কথার মত মনে হবে। লীলা কথাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করলে তার শ্রবণ কীর্ত্তনে ফলশ্রুতি নেই। লীলাকথাকে অপ্রাকৃত বোধে আস্বাদন করতে হবে তবেই পরমার্থ লাভ। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বললেন—

অর্জুন, জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোর্জ্জুন। গীঃ ৪।৯

আমার জন্ম এবং কর্ম বলতে লীলা যারা ঠিক ঠিক অপ্রাকৃত বোধে জানে আস্বাদন করে তারা যখন দেহত্যাগ করে যায়—তাদের আর পূনর্জন্ম হয় না তারা আমার কাছে এসে আমার নিত্য পার্ষদ গতি লাভ করে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে তত্ত্ব জেনেও ভুলে যাওয়া কি করে সম্ভব হয়। তা হবে। যেমন এক কড়া দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে সেই কড়ার মধ্যে একটা কুটো (তৃণখণ্ড) পড়েছে। দুধ যখন উথলে উথলে উঠছে তখন দুধের উচ্ছলনই দেখা যাচ্ছে তার ভিতরে আছে যে তৃণখণ্ড সেটিকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কড়ার ভিতরে সেই কুটোটি আছে এটি স্বীকার করতে হবে। এখানেও তেমনি যিনি লীলারসিক তাঁর মনে মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানরূপ কুটো আছে কিন্তু তিনি যখন লীলারস আস্বাদন করেন তখন লীলারসেরই অপূর্ব উচ্ছলন হয় তত্ত্বজ্ঞানরূপ কুটো মনের মধ্যে থাকলেও সেটি তলিয়ে যায় অনুভবের মধ্যে আসে না। রস আস্বাদনের সময় তত্ত্ব কথা মনে হলে আর রসের আস্বাদন হবে না। এখন যদি বলা যায় রাধারানীর যদি সত্যি ভয় নাই হয় তাহলে লীলায় যে ভয় পাচ্ছেন এ ভয় পাওয়া সত্য নয় এ ভয় পাওয়া মিথ্যা অভিনয় করছেন ভয় পাওয়ার মত দেখাচ্ছেন। যেমন অভিনয়ে লোকে ভয় পায় হাসে কাঁদে তার কোনটিই সত্যি নয় সবই মিথ্যা। এও সেইরকম। না তা বলা যাবে না। কারণ লীলা তো অভিনয় নয়। অভিনয় হল মিথ্যা। লীলা সত্য। লীলা যদি অভিনয় হয় তাহলে লীলা মিথ্যা হয়ে যায়। যদি বলা যায় লীলাকে মিথ্যা বললে আপত্তি কি? আপত্তি আছে। কারণ অভিনয় মিথ্যা বলে তা দেখলে বা শুনলে তার কোন ফলশ্রুতি নেই। তাতে কোন পরমার্থ হবে না। কিন্তু লীলাকথা মিথ্যা নয়—তার শ্রবণ কীর্তনে ফলশ্রুতি আছে পরমার্থ লাভ হবে। আর সেইজন্যই সাধকের সাধন। কারণ সাধন করে যদি সাধক পরমার্থ লাভ না করে তাহলে সাধনের প্রয়োজনীয়তা থাকেই না উপযোগিতাই থাকে না। সুতরাং তত্ত্বে ভয় না পাওয়া যেমন সত্য লীলায় ভয় পাওয়াও তেমনি সত্য। এখন এই ভয় পাওয়া এবং না পাওয়া তো পরস্পর বিরোধী এই পরস্পর বিরোধী বস্তু হয় কি করে—আবার যুগপৎ হয় অর্থাৎ একই সঙ্গে। এটি ক্রমিকতায় নয় আগে ভয় পান নি তত্ত্বে এখন লীলায় ভয় পাচ্ছেন তা বলা যাবে না। কারণ

যখন লীলায় ভয় পাচ্ছেন তখনও তিনি অভয় স্বরূপ। মানুষের স্বরূপে ভয় পাওয়া বা না পাওয়া ক্রমিকতায় হয়—যুগপৎ হয় না। মানুষের আগে হয় তো ভয় ছিল না—পরে কোন কারণে ভয় পাচ্ছে। যখন ভয় পাচ্ছে তখন তার ভয় না পাওয়ার অবস্থাটি নেই। বিরোধী বস্তু মানুষে হতে পারে ক্রমিকতায়। যুগপৎ হতে পারে না। একজন মানুষ আগে দরিদ্র ছিল পরে ধনী হয়েছে। ধনী দরিদ্র পরস্পর বিরোধী। কিন্তু মানুষ একই সময় ধনী দরিদ্র হতে পারে না। কিন্তু পরস্পর বিরোধী শক্তি একমাত্র ভগবানের স্বরূপে যুগপৎ থাকা সম্ভব। এরই নাম অচিন্ত্যশক্তি যাকে বলা হয় বীর্য—এই বীর্য ভগবানের যে ছটি 'ভগ' আছে তার মধে একটি। এই 'ভগ' আছে বলেই তাঁকে ভগবান বলা হয়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন—বিরোধী শক্তি শতনিধানত্বম্ অচিন্ত্যত্বম্। শত শত বিরোধী শক্তি যুগপৎ স্বরূপে থাকে তারই নাম অচিন্ত্যশক্তি—এরই নাম বীর্য। শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং ভগবান তাঁর তো হবেই আর তার হ্লাদিনী শক্তি মূর্তিমতী হলেন রাধারানী তাই তাঁর স্বরূপেও এই অচিন্ত্য শক্তির খেলা এর নামই লীলা। রাধারানী এবং গোবিন্দ ভিন্ন নন। শক্তি শক্তিমান অভিন্ন। বলা আছে রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি। ভগবানের এ ভগবত্তা মানুষের প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর। শ্রুতি বলছেন অবাঙ্ মনসোগোচরঃ। মানুষের বাক্য মন যার নাগাল না পেয়ে ফিরে আসে। তাই রাধারানীর তত্ত্বে ভয় না পাওয়া যেমন সত্য লীলায় যে ভয় পাচ্ছেন সেটিও তেমনি সত্য। রসিক নাগর সেটি প্রাণভরে উপভোগ করছেন। এ জগতে লীলা রসিক তাই এই লীলারসের আস্বাদনে ডুবে যান। আচার্য বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রথমেই লীলারস অর্থাৎ ভাগবত রস আস্বাদনের অধিকারী বলেছেন রসিক এবং ভাবুককে।

শ্রীমতী রাধারানীর এইরকম ভীত ভীত অবস্থা দেখেও রসিকবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নয়নভরে দর্শন করে রস আস্বাদনে যেন তৃপ্তি পাচ্ছেন না—আরও বেশী করে আস্বাদন করবার জন্য ঐ অবস্থাতেও দোলার বেগ আরও বাড়াতে লাগলেন। তখন রাধারানী আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে কি করবেন ঠিক করতে না পেরে নিজের আসন ছেড়ে নিজের বাহুলতা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করলেন। রসিকার এই প্রেম রসিকনাগর প্রাণভরে আস্বাদন করে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা রাখলেন। তিনিও দুই হাতে যে দোলার রজ্জু ধরা ছিল তা ছেড়ে

দিলেন দিয়ে দুই হাত দিয়ে ভীতিবিহ্বলা রাধাকে নিজের বক্ষস্থলে গ্রহণ করলেন। এখন তাঁরা দুজনেই তো দোলা ছেড়ে দিয়েছেন—সুতরাং নিরালম্বন-এ অবস্থায় তো পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তো অশেষ সামর্থবান-তাই কেবলমাত্র চরণ কমলের ওপর ভর দিয়ে বেগবতী দোলার ওপর অবস্থান করতে লাগলেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দের লীলা যেমন বিচিত্রা—তাঁর সামর্থ্যেরও তেমনি বলিহারি যাই।

এইভাবে দোলার ওপর শ্রীমূর্তি যুগল নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দুটিতে যেন একীভূত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন—এঁরাই বিশ্বের ভক্তজনের ধ্যানের মূর্তি। ঐঅপূর্ব রমনীয় মরি মরি রসিকজনের একান্ত আস্বাদনের। মনে হচ্ছে যেন রাধা চম্পক আর শ্যাম ইন্দীবর নিবিড় সংযোগে একীভূত হয়ে বাতাসের দোলায় দুলছেন দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছেন আর তার সঙ্গে এক মঞ্জু-সুষুমা বিকাশ করছেন। দুজনের গাঢ় আলিঙ্গনে চম্পক ইন্দীবরের (নীলপদ্মের) অনুপম সৌরভ বিস্তৃত হয়ে স্বর্গভূমিকেও অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠ বিহারিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নাসিকাকেও মাতিয়ে তুলছে। বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরীও আনন্দ সাগরে ডুবে গেছেন। শ্রীরাধাশ্যাম দোলার ওপর এইরকম নিরালম্বনে রয়েছেন এটি সখীরা দূর থেকে দেখতে পেলেন তখন তারা তাড়াতাড়ি এসে দোলা ধরে ফেললেন। তখন দোলার বেগ সংযত হল দোলা থেমে গেল। শ্রীমতী রাধারাণীই আগে দোলা থেকে নেমে এলেন—সখীদের কাছে পেয়ে যেন আশ্বস্তা হলেন—কৃষ্ণের এই বিড়ম্বনার কথা প্রাণখুলে তাদের কাছে বলতে লাগলেন—শ্রীমতীর বেশভূষার এই অবিন্যস্ত অবস্থার যে শোভা মাধুরী তা প্রাণসখীরা আনন্দভরে আস্বাদন করতে লাগলেন।

প্রেমময়ী ঠাকুরাণী ভালবাসা ঠাকুরাণী নিজে যে রস আস্বাদন, করেছেন-তা যেন সকলকে বিলিয়ে দিতে চান। কারণ প্রেম তো নিঃস্বার্থ প্রেমিক ভক্তই এ জগতে একা ভোগ করতে পারে না। অপরকে ভোগ করিয়ে তার তৃপ্তি। সেবক নরহরি যখন গৌরকে খাওয়ান—তখন পদকর্তা বলেছেন-গৌরের একলা খেতে ভাল লাগে না-তাই নিতাই মুখে তুলে দেয় গৌর নিজ করে—প্রাণ নিতাই খাও বলে। পূর্ব লীলা অর্থাৎ কৃষ্ণ লীলা এবং পর লীলা অর্থাৎ গৌরলীলা দুটি লীলা ভিন্ন নয়। করুণাময়ী রাধারাণীও আজ করুণার গরজে নিজের আনন্দ সখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতে চান তা না হলে তাঁর নিজের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হবে-না।

তাই প্রথমেই প্রধান অষ্টসখীর শিরোমণি শ্রীললিতাজীকে রাধারাণী কৌশল করে দোলার ওপর শ্রীকৃষ্ণের কাছে উঠালেন এবং নিজেই তাঁদের দোলাতে লাগলেন এবং তার সঙ্গে নিজে প্রেমভরে গান করতে লাগলেন। আমাদের এ-জগতে কামনাতে এ কথা চিন্তাও করা যায় না। এইখানেই কাম এবং প্রেমের মধ্যে পার্থক্য। কাম নিজেকে শুধু—সুখী করতে চায়-তার কেবল স্বসুখবাসনা কিন্তু প্রেম অপরকে সুখী করতে চায়। তার হল কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্য। কাম স্বার্থপর প্রেম নিঃস্বার্থ। কাম সঙ্কীর্ণ আর প্রেম হল উদার। কাম অমানিশার অন্ধকার আর প্রেম নির্মল ভাস্কর এর আগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দোলার ওপর রাধারাণীর যে অবস্থা করেছিলেন এখন ললিতাজীকে কাছে পেয়ে তারও সেই অবস্থা করলেন।

এইভাবে শুধু ললিতাজী নয়—বিশাখা চিত্রা চম্পকলতা রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গ বিদ্যা ইন্দুরেখা প্রভৃতি সকলকেই হিন্দোলায় উঠিয়ে তাদের ললিতাজীর মতই সান্দ্র সরস অবস্থা করে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসিকশেখর হিন্দোল থেকে নেমে এলেন। এতেই বুঝা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কতখানি সামর্থ্যবান। এতো গেল প্রধান্য অষ্টসখীর অবস্থা। এ ছাড়াও তো অগণিত ব্রজললনা আছেন। যে প্রধান হিন্দোলায় এঁরা রস আস্বাদনে বিভোর হলেন সেই কদমকাননে এ ছাড়াও অসংখ্য সুসজ্জিত দোলনা শোভা পাচ্ছে। তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেন রস আস্বাদনে মেতে উঠেছেন। পদকর্তা বলেছেন—মদনমোহন আজ মদনে মাতল । নাগরেন্দ্র তখন দুই দুই ব্রজসুন্দরীকে জোর করে বাহুবলে ভূমিতল থেকে উঠিয়ে এক এক দোলনায় উঠালেন এবং একাই কৌশল করে সমস্ত দোলার ওপর ভ্রমণ করে সব সখীকে দোলাতে লাগলেন। যদি মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ একা কিভাবে এ কাজ করতে পারলেন? এতো বহু পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কারণ ব্রজরাজনন্দন স্বরূপে স্বয়ং ভগবান—তাঁর অলৌকিক শক্তি মানুষের প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর তাঁর স্বরূপে অকরণীয় বলে কিছু থাকতে পারে না—তাঁর ইচ্ছাশক্তিই সব জায়গায় কাজ করে। যে ভাগ্যবানের তাঁর কৃপায় এ লীলা রস আস্বাদনের অনুভব হয় সেই ধন্য হয়ে যায়। একমাত্র কৃপা ছাড়া এ অনুভব সম্ভব হয় না। তাই শুদ্ধভক্ত সবছেড়ে শুধু তাঁর কৃপার দিকে চেয়ে থাকে।

প্রত্যেক হিন্দোলায় তো দুজন দুজন ব্রজরামাকে উঠিয়েছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মনে হল—আমি এই দুই দুই প্রাণসখীর মাঝে প্রতি দোলনাতেই থাকব। যেই

সেটি ইচ্ছা করলেন তখনই কাজ হয়ে গেল। কারণ তাঁর ইচ্ছা-শক্তিই কাজ করে। পিতামহ ভীষ্ম কৃষ্ণতত্ত্ব জানতেন তাই শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় কৃষ্ণকে সামনে পেয়ে বলেছিলেন—কৃষ্ণ, তোমার কাজ কাজ নয় তোমার ইচ্ছাই তোমার কাজ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্র যখন কাজ হয়ে গেল তখন ঐ দুই ব্রজাঙ্গনা প্রতি হিন্দোলায় দেখতে পেলেন শ্রীকৃষ্ণ নাগর তাঁদের বদন কমলের মধুপান করছেন। মধুরিপুর মধুপানে তাঁরা আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। নন্দনন্দনের পক্ষে এটি কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়—কারণ তাঁর ইচ্ছাশক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করে। তাই বলা আছে—আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে। কিন্তু কৃষ্ণের যে ইচ্ছা সেইফল ধরে।

এর পরে গ্রন্থকার বর্ষাহর্ষবনে কমলাকৃতি হিন্দোলার আকারে একখানি দোলা সাজানো আছে দোলাটি দেখলেই মনে হয় বুঝি একখানি ফোটা পদ্ম। বৃন্দাদেবীই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ইঙ্গিত করে সেই দোলা দেখিয়ে দিলেন। তখন শ্রীশ্যামসুন্দর প্রাণসখীদের সঙ্গে নিয়ে তাতে আরোহণ করলেন। পদ্মের মাঝখানে যেমন কর্ণিকার (চাকা) থাকে এখানেও এই কমলদোলার মাঝখানে সুকোমল কুসুম শয্যা বিছানো আছে যাতে বসলে রাধামাধবের সুখ হবে। সেই ফুলশয্যায় যুগলকিশোর বসলেন। রসিক নাগর তাঁর বামদিকে রসিকা নাগরী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাম বাহু রাধারাণীর কাঁধে রাখলেন—এতে শ্যামসুন্দর তো আনন্দ পেলেনই রাধারাণীও আনন্দ পেলেন। শ্যামের বাহু হলেও তা শ্যামসুন্দর এবং রাধারাণী দুজনকেই আনন্দ দিচ্ছে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর পীঠক ভাষ্যে এই উপমা দিয়ে বলেছেন যুবকের বাহু যুবতীর কাঁধে রাখলে তাতে যুবক যুবতী যেমন দুজনেই আনন্দ পায় তেমনি ভক্তি ভগবানের সম্পদ বটে কিন্তু এই ভক্তিরস আস্বাদনে ভগবান এবং ভক্ত দুজনেই আনন্দ পান। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলেছেন—

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়

পদ্মের মাঝখানে থাকে কর্ণিকার (পদ্মের চাকা)। আর তাকে ঘিরে ঘিরে থাকে পদ্মের পাঁপড়ি। এখানেও কমল দোলার মাঝখানে বসেছেন রাধা শ্যাম—আর তাকে ঘিরে প্রথম মণ্ডলীতে বসেছেন অষ্টদলে ললিতাদি অন্যান্য সখী অপূর্ব শোভাবিস্তার করে বিরাজ করছেন। এ মাধুরী দর্শন করে সেবাপরায়ণা বৃন্দাদেবী পরমানন্দে আগে থেকেই তাঁদের ভোজনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এতক্ষণ

দোলনায় দুলবার ফলে তাঁদের শ্রান্তি স্বাভাবিক। তাই মন বুঝে বৃন্দাদেবী তাদের সেবার দ্রব্য গুছিয়ে রাধাশ্যামের সামনে রাখলেন তার মধ্যে খেজুর জম্বু (জাম) দ্রাক্ষা (আঙ্গুর)-এই ফলই প্রধান। এ ছাড়া নানাবিধ উপাদেয় ফল সেবার জন্য দিলেন। কারণ সেবাই তাঁদের প্রাণ-তাঁরা সেবা ছাড়া কিছু জানেন না। রাধাশ্যামের ভোজনের পর যা কিছু অবশিষ্ট রইল সখীরা আনন্দ করে সে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। গ্রন্থকার আস্বাদন করেছেন—কমলদোলায় উঠে বসবার পরেই ফল ভোগ করবার আগেই সুস্নিগ্ধ রসাল পানক (সরবৎ) পান করেছিলেন। সে সরবতের আস্বাদন যেন অমৃতের আস্বাদনকেও নিন্দা করে। ফলের পরে তো জল পান করা যায় না তাই তাঁরা আগেই সরবৎ পান করেছেন। ফল ভোজনের পরে সেবাপরায়ণা বৃন্দাদেবী তাঁদের দিলেন সুরভিত সোনালী পানের খিলি সখীরা তা পরম আদরে গ্রহণ করে পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি উপহার দিচ্ছেন এই তাম্বুল বীটিকায় তাঁদের অধর সুরঞ্জিত হবে এবং বদন কমল সুবাসিত হবে।

কমল দোলায় বসেছেন রাধাশ্যাম এবং সখীরা। এখন দোলনা দোলাতে হবে। সেবার মূর্তি নান্দী এবং বৃন্দা কমল দোলার দুই পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে দোলা আনন্দভরে দোলাতে লাগলেন। এ-আনন্দলীলা দর্শন করে কিঙ্করীদের মুখপদ্মের উল্লাস মাধুরী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাঁরা তখন তাঁদের বীণানিন্দিত কণ্ঠে মধুরস্বরে গান করতে করতে দোলার তালে তাল সংযোজনা করলেন। তাঁরা গাইতে গাইতে আনন্দ সাগরে ডুবে গেলেন।

এইভাবে শ্রীশ্যামসুন্দর হিন্দোলা লীলায় সব সখীকে জয় করে আজ বিজয়ী শ্যামনগর। জয় লাভ করলে তো রত্ন কোষাগার লাভ করে বিজয়ী রাজারা। এখানেও মদনমোহন সখীদের চুম্বন আলিঙ্গনরূপ রত্ন লাভ করলেন। আজ ব্রজে বিজয়ী শ্যামনাগর। এ যেন লীলারণ সকলে বলে শ্যামের জয়। এরপরে কমলদোলা থেকে শ্যামসুন্দর নামলেন এবং লীলাশক্তি-রূপিনী কান্তাবর্গের সঙ্গে বনশোভা দর্শনের জন্য আনন্দভরে বন হতে বনান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। ভ্রমণ করতে করতে বনভূমিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেখতে পেলেন এক যূথীকুঞ্জ-এ জুঁইলতা হল বর্ষার জুঁই বর্ষার জল পেয়ে লতা ডগমগ হয়েছে অসংখ্য যূথীকুঁড়ি লতায় শোভা পাচ্ছে। এগুলি কুঁড়ি এখনও সম্পূর্ণ ফোটে নি ফুটব ফুটব ভাব। দেখে শ্যামসুন্দরের খুবই ভাল লাগল। ভাল লাগার একটি কারণও আছে। শ্রীগোবিন্দের মনের মধ্যে ভেসে

উঠল শ্রীমতী রাধারাণীর মুখচ্ছবি আর তারসঙ্গে রাধারাণীর রক্তিম অধরের ঈষৎ স্মিতি অর্থাৎ মৃদুমধুর হাসি তাও আবার চাপা। যাকে গোস্বামিপাদ বলেছেন অবহিত্থা। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে রাধারাণীর অন্তর আনন্দে ভরে গেছে ফলে শ্রীমুখে হাসি ফুটে উঠেছে হাসতে যাবেন এমন সময় দেখলেন সামনে বাদিনীর দল (যারা বিরোধিতা করেন) কিংবা কোন গুরুজন। তখন তো আর হাসতে পারা যায় না সেই হাসিটিকে চেপে নিলেন এরই নাম অবহিত্থা। এখানে যূথীকোরক দেখে শ্রীকৃষ্ণের সেইটি স্মরণ হল জুইকুঁড়িও ফুটব ফুটব করে এখনও সম্পূর্ণ ফোটে নি কুঁড়ি আধফোটা অবস্থাতে আছে। সেটি মনে হওয়ামাত্র শ্যামসুন্দর জুইকুঁড়িগুলি তুলে নিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরলেন। গ্রন্থকার আস্বাদন করছেন এটি শ্রীকৃষ্ণের জুইমালা হৃদয়ে ধারণ নয় যেন রাধারানীর মৃদু মধুর হাসি হৃদয়ে ধারণ করে পুলকিত হলেন।

যুগলকিশোর বনপথে চলেছেন সখীসঙ্গে। হঠাৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়ল। দেখলেন বর্ষার আগমনে আকাশে মেঘমালা শ্রীকৃষ্ণের নিজের অঙ্গকান্তি লাভ করে শোভা পাচ্ছে। তাদের নিজেদের যেন কোন স্বাতন্ত্র্যই নেই। সম্পূর্ণরূপে শ্যামসুন্দরে আত্মসমর্পণ করেছে যার ফলে তারা বর্ণসাদৃশ্য লাভ করেছে। আর সেই সঙ্গে নবজলধরে আছে বিদ্যুৎমালা। কারণ মেঘের চির সঙ্গিনী হল দামিনী। মেঘ বিদ্যুৎ ছাড়া মানায় না। এই দামিনী মালা যেন গোবিন্দ সঙ্গিনী ব্রজগোপীদের বিদ্যুৎ বরণ লাভ করে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁরাও সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে সৌদামিনীর বর্ণ সাদৃশ্য লাভ করেছে। এ লীলার মাধ্যমে সাধক জগৎ ভক্তজগৎ একটি দিক পেয়ে গেল। সাধনে ইষ্টে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তার শোভা নেই। স্বাতন্ত্র্যে শোভা হয় না। স্বাতন্ত্র্যে অভিমানে গর্বে ভক্তি মহারানী সেখানে থাকতে পারেন না। কারণ ভক্তি মহারাণী বড় কোমলাঙ্গী—অভিমানের তাপ সহ্য করতে পারেন না। অভিমানে থাকে 'আমি' 'আমার' বোধ। এতে বড় তাপ। 'আমি 'আমার দূর করে 'তুমি' তোমার' হতে পারলে তবেই ফললাভ এতেই ভজনের সার্থকতা। তাই ভজন পন্থায় মহাজনের নির্দেশ-

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং শুদ্ধ রৌরবম্।
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা ত্রীণি ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ।।

অভিমানকে মদ্যপানের মত অশুচি মনে করতে হবে আর নিজের

গৌরববোধকে মনে করতে হবে রৌরব অর্থাৎ নরকের মত ঘৃণ্য লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাকে মনে করতে হবে শূকরী বিষ্ঠার মত অপবিত্র। এই তিনটি ত্যাগ করে তবে হরিভজন।

সকলেই লক্ষ্য করলেন ভূমিতলে লালরঙের অসংখ্য ইন্দ্রগোপ কীট সারি বেঁধে চলেছে। গ্রন্থকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ আস্বাদন করেছেন এরা কীট নয় ব্রজবধূদের শ্রীচরণের অলক্তরাগ অর্থাৎ আলতার ছোপ এই চরণচিহ্ন ভূমিতলে শোভা পাচ্ছে।

হিন্দোলা লীলায় একাদশ সর্গে গ্রন্থরকারের শেষ মন্ত্র। এ মন্ত্রটি দ্বর্থক দুইভাবে অর্থ প্রকাশ করছে। প্রথমতঃ বর্ষার বর্ণনা আর দ্বিতীয়টি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুরসের আস্বাদন।

প্রথম বর্ষাপক্ষে বর্ষার কালরং এর ঘন মেঘমালা সমগ্র বনভূমিতে অতুল বৃষ্টিধারা বর্ষণ করতে লাগল—এই বর্ষার জল পেয়ে সুমনস অর্থাৎ মালতী ফুল ফুটেছে তার সৌরভে বনভূমি আমোদিত। আর যে সব লতা এর আগে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে প্রায় শুকিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল তারা নবধারা জলে পুষ্ট লয়ে পর্ববতী হয়েছে—আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের তরুলতার যে সম্পদ ফলফুল তাও বিকশিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করে পরমানন্দ অনুভব করছে। এ বনভূমির নাম হল বর্ষাহর্ষবন। আজ সেই বর্ষাহর্ষবন যেন হর্ষবর্ষায় অর্থাৎ আনন্দের বর্ষায় ডুবে গেল।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রস আস্বাদন পক্ষে—কৃষ্ণমেঘ বলতে এখানে নবঘনশ্যাম তাঁর তো মনোহর মূর্ত্তি তিনি আজ বনভূমিতে ব্রজবধূদের সঙ্গে হিন্দোলা লীলা আস্বাদনে অতুল ঘনরস বর্ষণ করতে লাগলেন। বর্ষাপক্ষে ঘনরসের অর্থ হল বর্ষণ অর্থাৎ বৃষ্টি কিন্তু এখানে ঘনরস বলতে বুঝাচ্ছে উজ্জ্বল রস [শৃঙ্গার রস মধুর রস] এই রসবর্ষণের ফলে যত সস্যালি আছেন সকলেই উৎফুল্ল হয়েছেন। এখানে সস্যালি অর্থাৎ আলি অর্থাৎ সখীর দল তারা সুমনস সকলেরই সুন্দর মন [বর্ষাপক্ষে সুমনস বলতে মালতী ফুলকে বুঝায়] সখীরা সুমনস বলে তারা প্রশস্ত অর্থাৎ সমাদরে সকলেই আদরণীয়া এবং প্রশংসনীয়া সৎ মন না হলে কি তাকে প্রশংসা করা চলে? প্রাণসখী সকলেই আজ শ্যাম সুন্দরের সঙ্গ পেয়ে আস্বাদনে উৎসববতী [পর্বপর্তী] অর্থাৎ উৎফুল্লা হয়েছেন। এই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তারা রতা

[বর্ষাপক্ষে লতা] অর্থাৎ অনুরাগিনী হয়ে চির আনন্দ নিত্য আনন্দ আস্বাদন করতে লাগলেন। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে হরিসঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কারও আনন্দ হতে পারে না। কারণ হরি যে আনন্দ তাঁর সম্পর্ক না হওয়া পর্যন্ত জীবের আনন্দ হতে পারে না। এটি নিত্যলীলায় ভগবান দেখালেন। গ্রন্থকার প্রাণভরে আস্বাদন করছেন। আমার কি মধুর লীলা নন্দনন্দনের এই মধুর লীলাবিহারে এই বর্ষাহর্ষ বনও আজ হর্ষবর্ষায় অর্থাৎ আনন্দ বর্ষায় নিমগ্ন হয়ে গেল।

জয় জয় শ্রীরাধামাধব জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর।

ইতি শ্লোক অনুযায়ী হিন্দোলালীলা সুখাস্বাদন নামে একাদশ সর্গ।।